# অদৃশ্য চোখ

# অদৃশ্য চোখ

আনন্দ বাগচী

যোগমায়া প্রকাশনী

৬০ পটুয়াটোলা লেন ॥ কলকাতা-৭০০০০৯

অদৃশ্য প্রথম প্রকাশ ॥ ২০ জুন
চোখ ১৯৫৮ ॥ রথযাত্রা

---

প্রকাশক ঃ শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ
৬০ পটুয়াটোলা লেন ॥ কলকাতা ৭০০০০৯ এবং
এল. আই. জি. বিল্ডিং ব্লক-সি. ফ্ল্যাট-থ্রি ॥
ফরটি নাইন, নারকেল ডাঙ্গা,
নর্থ রোড ॥ ক্যালকাটা সেভেন ল্যাখ ইলেভেন ॥

---

প্রচ্ছদ ঃ অঙ্গসজ্জা ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ॥

---

মুদ্রাকর ঃ শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী পান । জগদ্ধাত্রী প্রিন্টিং
ওয়ার্কস ॥ ৩৭/১/২ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড,
কলকাতা-৭০০০০৪ ॥

---

বাইন্ডার ঃ দি ক্যালকাটা বাইন্ডারস ॥

শ্রীবাদল বসু

প্রীতিভাজনেষু

আনন্দ বাগচী।

মূলত কবি। আনন্দ একদিকে যেমন কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, ঠিক সমান্তরাল ভাবে তিনি গদ্য সাহিত্যেও খ্যাতিমান।

সব রকম লেখায় তাঁর দখল কতখানি তা পাঠক-সমাজ অবশ্যই জানেন।

আনন্দ যখন ছোটদের জন্যে লেখেন, তখন তিনি ছোটদের মনের রাজ্যে প্রবেশ করে এমন কিছু তুলে আনেন, যা তারা ভালবাসে।

যখন বড়দের জন্য লেখেন, তখন যে কতখানি সিরিয়াস তাও তাঁর পাঠকরা ওয়াকিবহাল।

বিশেষ করে গোয়েন্দা কাহিনী লেখায় তাঁর জুড়ি পাওয়া কঠিন।

'অদৃশ্য চোখ' গ্রন্থটি তার প্রমাণ।

এই সংকলনে শিহরণ জাগানো গল্পের সূচী :

অনেকদিন পরে, বাইরে থেকে ফিরে এসে দুর্গাপুরের এই পিকচার পোস্টকার্ডের মত চোখ জুড়নো ছবির দিকে তাকিয়েও শুভঙ্করের বুকের ভেতরটা কি রকম করছিল। মেয়েরা এই রকমই, একচক্ষু হরিণীর মত, অন্ধ ; খুব কাছের মানুষকে অনেক সময়ই দেখতে পায় না। একটি কথা বলবার জন্যেই তপতীর কাছে ছুটে গিয়েছিল শুভঙ্কর, যে কথা মাসের পর পর মাস বছরের পর বছর বলা হয়নি। আজও হল না। আর কোনদিনই হবে না। তরুণ আই. পি. এস. শুভঙ্কর চাটুজ্জে আজ স্পষ্ট বুঝতে পেরে গেছে সে কথা। অনেক দেরী হয়ে গেছে তার। তপতী এখন আর তপতীতে নেই, সে এখন অন্য কোথাও বাক্‌দত্তা, তার ক' মাসের অনুপস্থিতিতেই ঘটে গেছে যা

ঘটায়। অথচ পরশু দিনও যখন তপতী তাকে দুজন নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে শর্ট রোডের এক বাংলোয় নিয়ে গিয়েছিল তখনও ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি শুভঙ্কর যে এদেরই একজনের কাছে তপতী দেহে মনে দায় বদ্ধ।

আজ সকালে হাতে কফির কাপ তুলে দিতে দিতে তপতী বিজয়িনীর মত হাসছিল। শুভঙ্কর সেটা লক্ষ্য করে বলেছিল, কি রে তপু, কিছু যেন বলতে চাস মনে হচ্ছে।

এইজন্যেই তোমাকে এত ভাল লাগে, শুভদা। তুমি ঠিক মনের কথাটি টের পেয়ে যাও।

তাই নাকি? শুভঙ্কর চোখে চোখে হাসল, মানুষের মনের কথা টের পাওয়াই তো আমার কাজ। জানিস তো, আমি জাতে পুলিশ।

তা পুলিশমশাই, বলুন তো পরশু যে দুটি উঠতি ছোঁড়াকে দেখলেন তারা পাত্র হিসেবে কেমন?

কে—শ্রীমন্ত ঘোষ আর প্রসূন দত্তর কথা বলছিস? হো হো করে হাসতে হাসতে শুভঙ্কর বলেছিল।

কাছে ঘন হয়ে এসে তপতী আদুরে গলায় বলেছিল, সত্যি, ঠাট্টা না কিন্তু—

শুভঙ্কর একটু চিন্তা করে বলেছে, জুয়েল। কিন্তু পাত্রী কারা?

ধর যদি আমিই হই। মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠেছে তপতীর।

ঠিক যেন পায়ের কাছে গোখরোর ফণা। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারেনি শুভঙ্কর। এই অপ্রত্যাশিতকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও আশঙ্কা করেনি কখনো। নিজেকে সামলে নিয়েছে অনেক কষ্টে। এক পলকের জন্যেও নিজের দুর্বলতা বুঝতে দেয়নি।

অন্যমনস্ক শুভঙ্কর কখন পৌঁছে গিয়েছিল তার গন্তব্যে। গল্ফ ক্লাবের মাঠ আর কাজুর বাগান ছাড়িয়ে রাস্তাটা এগিয়ে এসেছে শর্ট রোডের শেষ সারির কোয়ার্টারগুলোর দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকার

নেমে এসেছিল। ফসফরাস দেওয়া ঘড়ির ডায়াল চোখের সামনে ধরে সময় দেখল শুভঙ্কর—ছটা বেজে পনেরো মিনিট। যাক, ঠিক সময়েই এসে গেছে সে। পৌঁছেও গেছে, যথা জায়গায়। দিন তিনেক আগের এক বিকেলে এই কোয়ার্টারেই তপতী তাকে নিয়ে এসেছিল তার দুই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে দেবার জন্যে। না, ভুল হয়নি। মাঠের মধ্যে আলো না থাকলেও কোয়ার্টারগুলোর কম্পাউণ্ডে আলো জ্বলছিল, ফটকের নেমপ্লেট পড়তে কোন অসুবিধা হল না শুভঙ্করের। তপতীর বন্ধু দুজনকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার ভার তার ওপরে।

ফটক ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে। লোহার গেট খুলতে শব্দ হয়েছিল। শুনতে পেয়ে শ্রীমন্ত ঘোষ বাংলোর বারান্দায় বেরিয়ে এল। স্যুট বুট পরে তৈরি, হাতে খবরের কাগজ।

এই যে, আপনি! শ্রীমন্ত খবর কাগজ শুদ্ধু হাত তুলে নমস্কার করল, আপনি খুব পাংচুয়াল।

আপনিও কিছু কম যান না। বৈঠকখানায় তৈরি হয়েই বসে ছিলেন মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, কাগজ পড়ছিলাম। আসুন, ভেতরে আসুন।

শুভঙ্করের বুকের ভেতরে কেমন একটা চিনচিন ব্যথা হচ্ছিল। নিজের প্রেমিকার প্রণয়ীকে সে এই প্রথম দেখছে যেন। পরশু যখন এসেছিল তখনও জানত না তপতীর মনের কথা। তবে শ্রীমন্ত আর প্রসূন—এই দুই বন্ধুর মধ্যে কাকে যে তপতী মনোনীত করে রেখেছে তপতী প্রকাশ করেনি।

আর ভেতরে গিয়ে কি হবে? প্রসূনবাবুকে বলুন, আমি বাইরেই দাঁড়াচ্ছি।

আরে ভেতরে আসুন, বলছি।

অগত্যা শুভ বৈঠকখানায় ঢুকল। সোফার ওপরে তার মুখোমুখি বসতে বসতে শ্রীমন্ত বলল, প্রসূন খুব মুশকিলে ফেলেছে আমাকে।

শুভ উচ্চকণ্ঠে হাসল, কেন, টিপার্টিতে যেতে চাইছেন না নাকি?

তা নয়। শ্রীমন্ত হাসবার চেষ্টা করল, ওর ফিরতে দেরী হচ্ছে।

উনি বাড়িতে নেই? সে কি! কোথায় গেছেন? আজ তো অফিস নেই!

না না, অফিস কোথায়! দুপুরে খাওয়ার পর স্টেশনে গেল। বলে গেল খুব তাড়াতাড়িই ফিরবে।

কোন ট্রেন অ্যাটেণ্ড করতে?

হ্যাঁ, পাঠানকোটে কে নাকি আসছে। হাতঘড়ি দেখল, তিনটে নাগাদ গাড়িটা দুর্গাপুরে ইন করে। এখন বাজে ছটা সতেরো। কি জানি, এত দেরী তো কিছুতেই হবার কথা নয়।

শুভ কৌতুকের গলায় বলল, আজকালকার ট্রেন ভদ্রলোক নয়, কথা রাখে না।

শ্রীমন্ত বলল, না, এ গাড়িটা শেয়ালদা থেকে আসছে, খুব টাইমলি আসে।

কিন্তু এলেও উনি বোধহয় আজ যেতে পারবেন না।

কেন?

সঙ্গে লোক আসছেন যখন।

না। এখানে বোধহয় কেউ আসছে না, এলে বলত নিশ্চয়। তাছাড়া ও যাবে বলে গেছে। আমাকেই বরং তাড়া দিয়ে গেছে। যেন ঘুমিয়ে-টুমিয়ে না পড়ি! শ্রীমন্ত হাসল, আমি অবশ্য কথা রাখতে পারিনি, পেরী মেশনের কোর্ট সিনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আপনি খুব রহস্য উপন্যাস পড়েন, তাই না?

হ্যাঁ। খুব। তবে এ নেশা ধরিয়েছে প্রসূন। কি রকম গাদা গাদা বই কেনে দেখছেন তো?

শুভ দেখল। এর আগের দিনই লক্ষ্য করে গেছে। বৈঠকখানা ঘরের তাকগুলো পেপারব্যাকে ঠাসা!

তপতী দেবীর বাবা, প্রসূন বলছিল, খুব নাকি পাংচুয়্যালিটি পছন্দ করেন!

আমিও তাই ভাবছিলাম। শুভ হাতঘড়ির দিকে তাকাল, এখনো বেরোলে টাইমলি পৌঁছানো যেত! কি করা যায় বলুন তো?

সত্যি, এখন আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। এক কাজ করি বরং একটা চিঠি লিখে রেখে আমরা চলে যাই। ওর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে। সেণ্টার টেবিলের তলা থেকে একটা প্যাড টেনে নিয়ে শ্রীমন্ত দু-লাইন চিঠি লিখে কাগজখানা প্যাড থেকে খুলে শুভঙ্করের হাতে দিল, দেখুন চলবে?

সময় হয়ে যাওয়ায় শ্রীমন্ত এবং শুভঙ্কর চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, প্রসূন যেন সোজা তপতীদের ওখানে চলে আসে, চিঠিটায় শুধু এই কথাই লিখেছে শ্রীমন্ত। শুভ ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিক আছে।

সেণ্টার টেবিলের ওপর একটা অ্যাশট্রে চাপা দিয়ে রেখে শ্রীমন্ত বলল, চলুন, তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক। শুভ বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, শ্রীমন্ত ঘরের আলো নিভিয়ে শুধু বারান্দার আলো জ্বেলে দিয়ে বেরিয়ে এসে ফ্ল্যাশডোর টেনে দিল। ডোর ল্যাচ শব্দ করে অটোমেটিক লক হয়ে গেল।

কোণাকুণি শর্ট কাট করে ওরা যখন তপতীদের বাড়িতে এসে পৌঁছাল ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছটা। সবাই ড্রইং রুমে জড়ো হয়েছেন।

প্রকাণ্ড গোল টেবিলকে ঘিরে খান আষ্টেক হাল্কা আরামদায়ক চেয়ার পাতা। সেখানে তপতী, তপতীর বাবা, মা, আর বাবার এক বাল্যবন্ধু ডাঃ গাঙ্গুলী সরব আলোচনায় আসর একেবারে জমিয়ে তুলেছিলেন।

আরে এই যে! শুভঙ্করের দিকে চোখ পড়তেই অমায়িক হাস্যে বৃদ্ধ ফেটে পড়লেন, এবার শুভঙ্করের আর্যা শোনা যাক! এসো হে ডিটেকটিভ, ওঁকে তো চিনলাম না—

ইনি আমার বন্ধু শ্রীমন্ত ঘোষ, অ্যালয় স্টীলের এঞ্জিনীয়ার। শুভ বলল, ইনি ডক্টর জি. সি. গাঙ্গুলী, আর ওঁরা তপতীর মা আর বাবা।

শ্রীমন্ত যুক্তকরে প্রত্যেককে নমস্কার করল।

তপতী বিস্মিত গলায় শ্রীমন্তকে জিগ্যেস করল, আপনার বন্ধুকে কোথায় রেখে এলেন, তিনি আসেননি?

তপতীর বাবা হৃষীকেশবাবু ব্যস্ত গলায় বললেন, আরে তাই তো, আমার ডিপার্টমেন্টের সেই ব্রাইট চ্যাপকে দেখছি না তো, প্রসূন··· প্রসূনের কি খবর? তারও তো আসার কথা ছিল।

শ্রীমন্ত ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, ওর দেরী হবে, ও কাজে আটকে গেছে।

আহ হা! চুরুট মুখে তুলতে তুলতে তপতীর বাবা স্মিত হাসলেন, দি বয় ইজ অলওয়েজ বিজি, ইউ সী! লক্ষ্যটা তাঁর স্ত্রীর দিকে।

কিন্তু আমরা জ্যাঠামণি, আর দেরী করতে পারব না, গাঙ্গুলী জ্যাঠাকে উদ্দেশ্য করে তপতী কিঞ্চিৎ অভিমান ভরা গলায় বলল, এবার চা আনব।

কিন্তু আর একটু দেখলে হত না? হৃষীকেশবাবু চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দুর্বল গলায় বললেন।

তপতী উঠে যেতে যেতে কঠিন গলায় বলল, না।

সামান্য কয়েক মুহূর্তের জন্যে যে অস্বস্তিজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেটা সুকৌশলে চাপা দিয়ে দিলেন ডক্টর গাঙ্গুলী, তাঁর পূর্বতন প্রসঙ্গ জ্যোতির্বিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর আলোচনা তুলে। এবং সেই আলোচনার মধ্যেই তপতী আর ললিতা চা আর ঘরে তৈরি রকমারী জলখাবার নিয়ে এল এবং নিপুণ কায়দায় পরিবেশন করে গেল। এবং কিছু সময়ের মধ্যেই গল্প এমন জমে উঠল যে চায়ের টেবিলে প্রসূনের অনুপস্থিতির কথা কারোই আর মনে থাকল না।

এই অবস্থা কতক্ষণ চলত কে জানে যদি না তপতীর ছোট ভাই বিকাশ ছুটতে ছুটতে ভগ্নদূতের মত প্রবেশ করত। সবাই চোখ তুলে তাকালেন। বিকাশ টেবিলের এক কোণে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তপতীর কানে কানে কি বলল। সে তখনও হাঁপাচ্ছিল।

তপতীর মা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, কি রে তপু, কি হয়েছে?

তপন্তীকে সামান্য আরক্ত দেখাল। বলল, কিছু না মা। ওকে পাঠিয়েছিলাম প্রসূনবাবুর খোঁজে। তা কলিংবেল টিপে টিপে হয়রাণ হয়ে ফিরে এসেছে। ভেতর থেকে কেউ সাড়া দেয়নি, তাই বলছে।

সাড়া দেবে কি! বাড়িতে যে কেউ নেই। প্রসূন বাইরে গেছে। শ্রীমন্ত বলল, ওকে আমাদের ওখানে পাঠাবার আগে যদি আমাকে বলতেন—

বিকাশ বলল, আপনাদের চাকরটা তো আছে। ভেতরে আলো জ্বলছিল—

চাকর দুদিন হল পালিয়েছে। কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছিল—ঠিক দেখেছ?

হ্যাঁ। জানলার কাঁচে স্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছিল। বাইরের ফটকটাও হাট করে খোলা ছিল। কিন্তু ভেতরে কোন শব্দ পাইনি অবশ্য। বাইরের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, আমি নিজে হাতে ঠেলে দেখেছি।

শ্রীমন্ত শুভর দিকে তাকাল। দুজনের চোখাচোখি হল। তারা কম্পাউণ্ডের ফটক বন্ধ করে এসেছিল মনে পড়ল।

আশ্চর্য লাগছে। যাবেন নাকি একবার? শ্রীমন্ত জানতে চায়।

চলুন, দেখে আসা যাক। চোর-টোর ঢোকা আশ্চর্য নয়। শুভ বলে।

চাবি দিয়ে দরজা খুলতেই প্রথমে বসবার হলঘর, আলো জ্বলছিল। কিন্তু মানুষের কোন চিহ্ন বা সাড়া পাওয়া গেল না। সোফার সেণ্টার টেবিলটার ওপরেই চোখ পড়ল সকলের আগে। সেখানে ইংরেজী খবরের কাগজখানার পাশে একটি অ্যাশট্রের ওপর ইঞ্চি দুই ছাই-সমেত একটি সিগারেট, নিভে আছে। অন্য অ্যাশট্রেটার তলায় যাবার সময় যে চিঠিটা রেখে গিয়েছিল শ্রীমন্ত, সেটা কিন্তু নেই। অর্থাৎ তারা বেরিয়ে যাবার পর কেউ ঢুকেছিল এবং যে ঢুকেছিল সে চিঠিটা পড়েছে। আশেপাশে তাকাল শুভঙ্কর। কিন্তু চিঠিটার কোন চিহ্ন নেই। সেণ্টার টেবিলের তলার থাকটায় শুধু খানকয়েক

সায়েন্স জার্নাল আর মিষ্ট্রি পেপারব্যাক সহ শ্রীমন্তর চিঠি লেখার প্যাডটা রয়েছে, আর কিছু নেই।

যদিও বাড়ির ভেতর ঢুকবার আগেই শ্রীমন্ত দরজা বন্ধ দেখে বার দুই কলিংবেল টিপেছিল তবু আর একবার প্রসূনের নাম ধরে জোরে হাঁক দিল। কোন সাড়া নেই তবু। শোবার ঘরে যেতে হলে হলঘর থেকে যে প্যাসেজটায় বেরোতে হয় সেটা অন্ধকার। যাবার সময় যেমন ছিল তেমনি আছে। শ্রীমন্ত সাবধানে প্যাসেজে বেরিয়ে আলো জ্বালাল। শুভঙ্করও শ্রীমন্তকে যে কোন মুহূর্তে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। কারণ বিচিত্র নয়, বাড়ির খিড়কি দরজা বা কোন জানলা ভেঙে চোর ভেতরে ঢুকেছে। এবং যদিই কেউ বা কারা ভেতরে ঢুকে থাকে তারা যে বেরিয়েই গেছে এমন কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং হঠাৎ কোন আক্রমণ আসা অস্বাভাবিক নয়। শ্রীমন্ত প্রথম নিজের ঘরের আলো জ্বেলে ভেতরে উঁকি দিল। পাশের সংলগ্ন বাথরুমের ভেতরটাও দেখে নিল। না, কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই। তারপরে প্রসূনের ঘরের আলো জ্বেলেই সভয়ে এক পা পিছিয়ে এল। মুখ দিয়েও আর্তবিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এসে থাকবে। শুভঙ্কর একলাফে শ্রীমন্তকে ডিঙিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ভেতরে যে দৃশ্যটা দেখল সেটা বুঝতে সেকেণ্ড দুই সময় লাগল। আরে! এ কি ব্যাপার? বলেই শুভঙ্কর ঘরের মধ্যে ছুটে গেল। ঘরের মেঝেয় প্রসূন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। শুয়ে আছে খুব অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে। পরণে স্যুট, নেকটাইটা বগলের তলা দিয়ে বেরিয়ে আছে। মুখটা দরজার দিকে কেমন বেকায়দায় ঘোরানো। প্রসূনের দেহটা যে সংজ্ঞাহীন তা তার তাকিয়ে থাকা অপলক চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারা গেল। কাছে গিয়ে নিচু হয়ে তাকে তুলতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল শুভঙ্কর। তাড়াতাড়ি নাকের সামনে হাত রাখল, তারপর কব্জি টিপে নাড়ি দেখল, যদিও তার দরকার ছিল না শুভঙ্করের। বিবর্ণ মুখ, স্থির চোখ আর ঠোঁটের পাশে জমে থাকা রক্তাভ গ্যাঁজলা

দেখেই বুঝে নিয়েছিল প্রসূনের দেহ প্রাণহীন। গায়ে হাত দিতে সেই অনুমানই প্রমাণিত হল।

প্রসূনের কি হয়েছে? শ্রীমন্ত নিজেকে সামলে নিলেও তার গলার স্বর তখন কাঁপছে। হয়তো তার মনেও একই সন্দেহের ছায়া পড়েছে ততক্ষণ।

কোন আশা নেই ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে শুভঙ্কর উঠে দাঁড়াল—কাছে কোন বাড়িতে টেলিফোন আছে?

আছে। কিন্তু কেন, কি হয়েছে? শ্রীমন্তর গলা ভয়ে যেন বুজে এল।

এক পলক শ্রীমন্তর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কঠিন গলায় শুভঙ্কর বলল, মনকে শক্ত করুন, শ্রীমন্তবাবু। আপনার বন্ধু আর বেঁচে নেই।

অ্যা! বেঁচে নেই! বলেই পাগলের মত প্রসূনের দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল শ্রীমন্ত, বলিষ্ঠ দুটো হাত দিয়ে শুভঙ্কর তাকে ধরে ফেলল।

স্থির হোন! ও রকম করবেন না, শ্রীমন্তকে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে প্রকৃতিস্থ করে শুভঙ্কর বলল, কোন্ বাড়িতে টেলিফোন আছে, আমাকে নিয়ে চলুন।

শুভঙ্করের টেলিফোন পেয়ে থানার ও. সি. হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির হলেন, সঙ্গে দুজন কনস্টেবল এবং একজন সাব-ইন্সপেক্টর। থানার অফিসার-ইন চার্জ এবং হাসপাতালের রেসিডেন্সিয়্যাল সার্জন দুজনেই শুভঙ্করের পরিচিত।

ও. সি. একখানা দর্শনীয় সেলুট ঠুকে শুভঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জানাচেনা কেউ স্যার? রিলেটিভ?

ফ্রেণ্ড।

কজ অব ডেথ, স্যার?

অথরিটি তো সঙ্গেই আছেন। শুভঙ্কর ডক্টর তালুকদারকে ইঙ্গিত করল।

ডাক্তার মৃতদেহ নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করলেন। কনস্টেবল দুজনের সাহায্যে মৃতদেহটি উল্টে শোয়ালেন। আপাতদৃষ্টিতে মৃতদেহে কোন ক্ষতচিহ্ন বা আঘাতের দাগ চোখে পড়ল না। মাথায় লোহার ডাণ্ডার আঘাত বা বুকে পিঠে ছুরি অথবা বুলেটের ক্ষত, সচরাচর যেভাবে মৃত্যু-ঘটানো হয়ে থাকে, সেসব কিছুই নেই প্রসূনের দেহে। রক্তপাতহীন মৃত্যু।

সুইসাইড অথবা ন্যাচারাল ডেথ, ডক্টর? ও. সি. প্রশ্ন করেন।

ন্যাচারাল বলতে? শ্রীমন্ত জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারে না।

ও. সি. খানিকটা বিষণ্ণ মুখে উত্তর দিলেন, মৃত্যু তো আজকাল বয়স-টয়স মানছে না। অনেক ইয়ংম্যানও হার্টস্ট্রোক-এ কিংবা সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে আজকাল চলে যাচ্ছেন। যদি বিষক্রিয়ায় মৃত্যু না হয়ে থাকে তাহলে কাজে কাজেই ওইসব—

ও. সি.-র কথা শেষ হল না, ডাক্তার চমকে উঠে বললেন, আই সী!

শুভঙ্কর জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে তাকাল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি টাইয়ের নটটা আলগা করে প্রসূনের গলার বোতাম খুলে দিলেন। তারপর ঘাড়ের তলায় হাত দিয়ে কিছু খুঁজলেন মনে হল। কনস্টেবলরা প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক্তারের ইঙ্গিতে তারা দেহটাকে আবার উপুড় করে দিল। শার্টের কলার সরিয়ে ঘাড়ের কাছটায় আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে কিছুক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার।

দেখুন তো মিস্টার চ্যাটার্জী, কিছু ফিল করেন কিনা? শুভঙ্করকে জায়গা ছেড়ে দিলেন ডাক্তার।

প্রসূনের ঘাড়ে হাত দেবার আগেই শুভঙ্কর বুঝে নিয়েছিল ব্যাপারটা। হয়তো আরও অনেক আগেই, যখন প্রথম মৃতদেহকে উল্টে শোয়ানো হচ্ছিল, তখনই। কলারের তলায় দাগটা দূর থেকেই তার চোখে পড়েছিল। এবার হাঁটু মুড়ে বসে দু' আঙুলে

হারমোনিয়ামের রীড টেপার মত আঙুল চালিয়ে শুভঙ্কর বলল, ইয়েস ডক্টর, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

শ্রীমন্ত অসহিষ্ণু গলায় বলল, কি হয়েছে সেইটে বলুন না, হেঁয়ালি করছেন কেন আপনারা! প্রসূনের ঘাড়ে কি দেখছেন?

উত্তেজিত শ্রীমন্তর দিকে তাকিয়ে শুভঙ্কর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, ঠোঁটে এক ধরনের শুকনো হাসি, স্যরি শ্রীমন্তবাবু, পোস্ট-মর্টেম না হওয়া পর্যন্ত বলা ঠিক হবে না—তবু বলছি, ওঁর মৃত্যুটা আত্মহত্যা নয়, ন্যাচারাল ডেথও নয়।

নয়? কি তবে শুভঙ্করবাবু?

মার্ডার। অবশ্য পোস্টমর্টেম না হলে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় ওঁর ঘাড়ে কেউ পিছন থেকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছিল। সেই আঘাতে ঘাড়ের কাছের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু প্রসূনকে—

তেমন কোন শত্রু ছিল ওঁর?

সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, শুভঙ্করবাবু। প্রসূনের সঙ্গে কারো মনোমালিন্য ছিল না, কারো সঙ্গে ঝগড়া হয়নি কোনদিন। হাসি খুশি আমুদে ছেলে প্রসূন, আপনিও তো পরশু দিন ওর চেহারা খানিকটা দেখেছেন। বাড়িতে এসে ওকে খুন করবার মত আমি তো কাউকে কল্পনাই করতে পারি না।

হুঁ। আমিও তাই ভাবছিলাম। তবে চোরেরাও অনেক সময় ধরা পড়ে যাবার মুখে মরীয়া হয়ে খুন জখম করে থাকে। চার-পাশটা আমাদের আগে ভাল করে দেখতে হবে। কোন দরজা বা জানলা ভেঙে কেউ ভেতরে ঢুকেছিল কিনা।

ও. সি. বললেন, ভেতরে তো কেউ নির্ঘাত এসেছিল নইলে এভাবে হত্যা করবে কি করে? অবশ্য এটা যদি শেষ পর্যন্ত হত্যাই হয়।

তার কোন মানে নেই। শুভঙ্কর বলল, দরজা জানলা ভেঙে অনধিকার প্রবেশ করেছিল এমন না-ও হতে পারে। কিছু বিচিত্র

নয় যে হত্যাকারী প্রসূনবাবুর সঙ্গেই বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল। হয়তো সে ওঁর পরিচিতই কেউ হবে। প্রসূনবাবু ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেননি তিনি মার্ডারারকে বাড়ি বয়ে নিয়ে এসেছেন। বাই দি বাই, শ্রীমন্তবাবু, উনি স্টেশনে কাকে রিসিভ করতে গিয়েছিলেন বলতে পারেন ?

শ্রীমন্ত ঘাড় নাড়ল, না। প্রসূন বলেনি আর আমিও জিগ্যেস করিনি। ও শুধু বলেছিল ও পাঠানকোট অ্যাটেণ্ড করতে যাবে! পরিচিত কাউকে স্টেশনে মিট করবে এটাই আমি বুঝেছিলাম। কোন কৌতূহল মনে জাগেনি তখন।

শ্রীমন্ত ভাবল ব্যাপারটা। শুভঙ্কর ততক্ষণে প্রসূনের পকেট হাতড়াতে শুরু করেছিল। প্যান্টের পকেট থেকে বেরোল মানি ব্যাগ আর চাবির রিং। তাতে সদরের এবং ঘরের দুটো চাবিই রয়েছে, আলমারি বা বাক্স সুটকেশের চাবি নয়। আর বেরোল একখানা প্ল্যাটফর্ম টিকিট, তারিখটা আজকেরই। ঘরের একপাশে একখানা সিঙ্গল ইংলিশ খাট। নিভাঁজ বেডকভার ঢাকা বিছানার ওপরে গায়ের কোটটা খুলে ছুঁড়ে ফেলেছিল হয়তো। হাত গলিয়ে কোটের পকেট থেকে পেল শ্রীমন্তর লেখা সেই ছোট্ট চিঠিটা। ড্যালা পাকানো অবস্থায়। আর পাওয়া গেল একটা সিগারেটের প্যাকেট আর গ্যাস-লাইটার। মানি ব্যাগ খুলে দেখল দশ পাঁচ আর এক টাকায় মিলিয়ে পঁয়ত্রিশটা টাকা, এবং কিছু খুচরো পয়সা। একটা ফোল্ডের মধ্যে ঠিকানা লেখা গুটি দুই কাগজ, নিজের নাম ছাপানো খান দুই ভিজিটিং কার্ড। ব্যস, আর কিছু নেই। পকেট থেকে উদ্ধার করা জিনিস-গুলো ও. সি-র হাতে সমর্পণ করে শুভঙ্কর সুইচ বোর্ডের তলায় মেঝেটা ভাল করে দেখল। সমস্ত ঘরটাই কয়েক চক্কর দিয়ে আর কোন ক্লু পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখল। অন্তত সেই অস্ত্রটা ঘরের মধ্যে পড়ে থাকাই স্বাভাবিক ছিল। ভারী কিছু জিনিস দিয়েই প্রসূনের ঘাড়ে চোট দেওয়া হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর সেই জিনিস লোহার রড বা ওই জাতীয় কিছুই হবে, কারণ ঘাড়ের হাড়

যেভাবে ভেঙেছে তাতে খুব মোটা কিছু দিয়ে যে আঘাত করা হয়নি অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না। শুভঙ্কর হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচে উঁকি দিল। কিন্তু না, সে রকম কিছু সেখানে নেই। হঠাৎ কি একটা জিনিস কুড়িয়ে পকেটে পুরল শুভঙ্কর। ব্যাপারটা আর কেউ না দেখলেও শ্রীমন্তর নজর এড়াল না।

সমস্ত বাড়িটাই অবশ্য তল্লাসী চালানো হল। সাব-ইন্সপেক্টর ছোকরা মানুষ, বেশ করিৎকর্মা। বাড়ি সার্চ করার ব্যাপারটা দুজন কনস্টেবল সহযোগে সে-ই সারল। শুভঙ্করের অনুমান সম্ভবত ঠিক। দরজা জানলা কোথাও ভাঙা বা খোলা অবস্থায় দেখা গেল না। সুতরাং আততায়ী আগে থেকে অন্য উপায়ে হয়তো ভেতরে ঢোকেনি, ঢুকেছিল খুব সম্ভব প্রসূনের সঙ্গে সঙ্গেই। হয়তো প্রসূনই তাকে নিয়ে এসেছিল বাড়ির ভেতর, হয়তো নিজের ঘর পর্যন্তই নিয়ে এসেছিল। কিংবা বসবার ঘরে বসিয়ে রেখে প্রসূন যখন নিজের ঘরে এসে জামা প্যান্ট ছাড়বার উদ্যোগ করছে সে সময় চুপি চুপি ভেতরে চলে এসে পিছন থেকে মারাত্মক আঘাত হেনেছে আততায়ী। প্রসূনকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করার সুযোগ দেয়নি। তারপর তার কাজ সেরে, প্রসূনের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে, বসবার ঘরে ফিরে গেছে। গোদরেজের ডোর ল্যাচ, ভেতর থেকে তালা খুলতে চাবি লাগে না, আবার বাইরে থেকে বন্ধ করতেও চাবির দরকার পড়ে না। বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিলেই অটোমেটিক লক হয়ে যায়। তাই হত্যাকারীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে এতটুকুও অসুবিধে হয়নি। তপতীর ভাই যখন এসে কলিংবেল বাজিয়েছিল তার একটু আগে বা পরেই সে হয়তো সরে পড়েছে। শ্রীমন্ত কখন ধপ করে ঘরের বিছানার ওপর বসে পড়েছিল। তার চোখের দৃষ্টিটা যেন পাথরের মত, মুখে কোন কথা নেই।

শুভঙ্কর প্রসূনের পায়ের মোজা টেনে কি দেখছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, শ্রীমন্তবাবু, আপনি এ ঘর থেকে যান। এই দৃশ্য আপনার সহ্য হচ্ছে না আমি জানি। বাইরে যান, বোধহয় তপতী

এসেছে। ওকে আপনি সামলান গে। বলবেন, ও যেন ভেতরে না আসে।

শ্রীমন্ত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে মৃদু গলায় সে শুধু বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

শ্রীমন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই শুভঙ্কর ও. সি.-কে বলল, একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ্য করেছেন মিস্টার সাহা? মৃতের রিস্ট-ওয়াচটা খেয়াল করেছেন?

পাশের টেবিলে খাতা কলম ফেলে তাড়াতাড়ি চলে এলেন ভদ্রলোক, না স্যার, লক্ষ্য করিনি তো!

প্রসূনের বাঁ হাতের কাফলিংক খুলে হাতটা গুটিয়ে দিল শুভঙ্কর।

মাই গড! এই নতুন ঘড়িটা এভাবে চুরমার হল কি করে!

আর কিছু নজরে পড়ল?

একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ও. সি. আবিষ্কারের গলায় বললেন, ইয়েস স্যার!

ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে। ছ'টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে। তার মানে স্যার—

এটাই প্রসূনের মৃত্যুর সময়। ডেটটা লক্ষ্য করুন। তার মানে আজ ছটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে আততায়ী প্রসূনবাবুকে সেই মারাত্মক আঘাতটি হানে। লোহার রড জাতীয় কিছু দিয়ে আঘাতটা করা হয়। আঘাতটা ঘাড়ের হাড় ভেঙেও থামেনি, বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ির ওপরে গিয়ে পড়ে। ফলে ডায়ালটা চুরমার হয়ে যায়। হয়তো ব্যালেন্স স্প্রিং ভেঙে গিয়েছে।

ছাট মীন্স, এই রিস্ট-ওয়াচটাই প্রসূনবাবুর হত্যার ফার্স্ট হ্যাণ্ড সাক্ষী।

তাতে আর সন্দেহ কি। আপনার একটি মূল্যবান উইটনেস। যে ঘড়ি কাঁটা ধরে সত্যি কথা বলছে, একেবারে ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড ইস্তক। কি ডক্টর তালুকদার, মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে আপনার পরীক্ষা কি বলে?

তালুকদার তখন টেবিলটার আর একপ্রান্তে বসে সম্ভবত ডেথ সার্টিফিকেট লিখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, ময়না তদন্ত না করা পর্যন্ত সঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে মনে হয় ঘণ্টাখানেকের বেশী আগে ওর মৃত্যু হয়নি।

ও. সি. বললেন, তা যদি হয় তাহলে ঘড়ির সঙ্গে সময়টা মিলেই যাচ্ছে।

হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়েছিলেন মিঃ সাহা। কোন প্রয়োজন ছিল না তবু কানের কাছে ধরে ঘড়ির বন্ধত্ব সম্বন্ধে যেন নিঃসন্দেহ হলেন। শুভঙ্কর প্রসূনের বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে কি দেখছিল মন দিয়ে। তার কানে কারো কথা পৌঁছচ্ছিল এমন মনে হয় না। শুভঙ্করের এই এক স্বভাব। তার ভুরুজোড়া প্রায় আধ ইঞ্চি কপালের ওপর উঠে গেছে, চোখের তারা দুটো নাক বরাবর স্থির, অর্থাৎ দৃষ্টিটা ঈষৎ ট্যারা, শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বইছে কি বইছে না—ঠিক যেন ধ্যান সমাধি, মানে জেগে জেগে ঘুমোনো। ভেতরে যে চিন্তার তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে তার বাহ্যিক প্রমাণ শুধু কপালের মাঝ বরাবর পেন্সিলের গভীর দাগের মত একটা রেখা ফুটে উঠেছে। রগের পাশে একটা ফুলে ওঠা ভেন্ রক্তের চাপে দবদব করছে। যেন কাছে কান নিয়ে গেলে রক্তের ছলক শোনা যাবে।

ও. সি.-র মতই শুভঙ্করও সেই সন্ধ্যে থেকে বিশ্রাম পায়নি। অক্লান্ত ভাবে সে খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে দেখছিল। বাংলোয় তৃতীয় কোন সংবাদদাতা না থাকায় শুভঙ্করকে শ্রীমন্তের ওপরেই নির্ভর করতে হচ্ছিল। থেকে থেকে বারবার প্রশ্ন করে শ্রীমন্তকে উত্যক্ত করছিল সন্দেহ নেই। ছোকরা চাকর রামচন্দ্র থাকলে তার কাছ থেকে হয়তো কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু সে বিদায় হওয়ায় এখন শুধু শ্রীমন্ত ভরসা। শ্রীমন্তের কাছ থেকে জানা গেল প্রসূনের নিকট আত্মীয় বলতে কেউ নেই। মা-বাবাকে বাল্যকালেই হারিয়েছিল সে। নিকটজন বলতে এক জ্যেঠতুতো দিদি জামাই-

বাবু রয়েছেন। থাকেন হাবড়ার অশোকনগর কলোনীতে। প্রসূনের ছাত্রদশা এঁদের আশ্রয়েই কেটেছে। তাই আজ জীবনে অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠা পাবার পরও প্রসূন দিদি-জামাইবাবুকে নিয়মিত মনে রেখেছে। মানিঅর্ডারের কুপনগুলোই তার প্রমাণ। সব মানুষ অকৃতজ্ঞ বেইমান নয়। অতীতের স্নেহ-ভালবাসা-সাহায্য ভুলে যায় না।

প্রসূনও যায়নি। আর তাই দিদির অপদার্থ ছেলেটাকে পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল। সে নাকি মাঝে মাঝে ভুঁইফোঁড়ের মত উদয় হত, নাছোড় পাওনাদারের মত। নিরুপায় প্রসূন প্রতিবারই খাইয়ে-দাইয়ে হরিপদর দাবী পূরণ করে তবে রেহাই পেত। যাই হোক, কথাটা এই, প্রসূনের কুড়ি হাজার টাকার একটা লাইফ ইনসিওর আর ব্যাঙ্কে সামান্য হাজার কয়েক টাকা আছে। সে টাকার উত্তরাধিকারী হিসেবে হরিপদর নামই দেওয়া আছে। তাই এই মৃত্যুতে আর্থিক ভাবে যদি কারো লাভ হয়ে থাকে সে ওই ভাগ্নেটির।

এটা ঠিক, লাইফ ইনসিওরের বিশ হাজার টাকা খুব খারাপ নয়। ওর থেকেও কম টাকার জন্যে মানুষের প্রাণ চলে যাচ্ছে। আর হরিপদ হচ্ছে এ যুগের একটি বখে যাওয়া বেকার যুবক। মায়া দয়া সেন্টিমেন্টের বাষ্প তার মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া ইদানীং নাকি নেশাও ধরেছিল। হয়তো ম্যানড্রেক্স গিলত, পাড়ায় মস্তানি করে বেড়াত।

তবু কোথায় যেন হিসেব মিলছিল না শুভঙ্করের। শ্রীমন্তর কাছেই শুনেছে হরিপদ দশ-বিশ টাকার জন্যেও মধ্যে মধ্যে ধর্না দিত। শেষবার যখন এসেছিল মামা-ভাগ্নের মধ্যে বচসা পর্যন্ত হয়ে গেছে। কিন্তু হলেও ঠিক এই খুনটা হরিপদর ক্যারেকটারের সঙ্গে মিলছে না। হরিপদ যদি এই কাজ করত তবে প্রসূনের পকেটের মানিব্যাগ কিংবা আঙুলের হীরের আংটিটা নিশ্চয় উধাও হত। চাই কি আলমারী দেরাজের তালা ভাঙার চেষ্টাও হত।

শ্রীমন্তদের কোয়ার্টার থেকে শুভঙ্কর যখন বেরোল তখন অনেক রাত। ডেডবডি পুলিশ মর্গে চালান হয়ে গেছে। একজন মানুষের

পক্ষে এত বড় বাড়িতে এ রকম অবস্থায় থাকা কঠিন হবে ভেবেই রাতটার মত শ্রীমন্তকে সঙ্গে নিয়েছিল সে। আজ রাতে তাদের বাড়িতে শ্রীমন্ত খাবে এবং শোবে। কোয়ার্টারের বারান্দায় অবশ্য দুজন কনস্টেবলকে মোতায়েন করে গিয়েছিলেন থানার ও. সি.। কিন্তু এত বড় শোকের সময় একা রাত্রিবাস করা উচিত হবে না নিশ্চয়, তাছাড়া বিপদের উৎস যখন কিছুই অনুমান করা যাচ্ছে না তখন আর একটি দুর্ঘটনা যে ঘটবে না তা কে বলতে পারে।

রাত্রের আহার সেরে পাশাপাশি বিছানায় বসে সিগারেট টানতে টানতে কথা হচ্ছিল শ্রীমন্ত আর শুভঙ্করের মধ্যে। শোবার আগের শেষ সিগারেট, ঘুমের আমেজ আসছিল ধীরে ধীরে। বাইরে রাত ক্রমশ শীতল হচ্ছিল। কাঁচের জানলাগুলো মোটা পর্দা দিয়ে ঢাকা। তবু শীত করছিল। শ্রীমন্ত তার শালটা মুড়ি দিয়ে বসেছে। শুভঙ্কর লেপটাকেই চাদরের মত জড়িয়ে নিয়েছে। দুটি খাটের মাঝখানে নীলচে টেবল্ ল্যাম্পটা জ্বলছে।

আচ্ছা, শ্রীমন্তবাবু—কিছুকাল থেকে কি কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলেন আপনার বন্ধুর ?

শ্রীমন্ত কিছুক্ষণ ভাবল।—কই তেমন কিছু তো নজরে পড়েনি আমার—তারপর একটু ইতস্তত করে ফের বলল, আপনি কি ধরণের পরিবর্তনের কথা—

অস্বাভাবিক আচার-আচরণের কথাই মীন করছি।

শ্রীমন্ত মাথা নাড়ল।

কিংবা এমন কোন কথা কখনো বলেছেন যা আপনার কানে নতুন ঠেকেছে—ভাল করে ভেবে দেখুন। আপনার তো ডায়েরী লেখা অভ্যেস আছে।

শ্রীমন্ত বলল, কস্মিনকালেও না। বরং বলতে পারেন প্রসূনের ডায়েরী লেখার হ্যাবিট ছিল। শোবার আগে ডায়েরী না লিখলে ওর ঘুমই হত না।

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে শুভঙ্কর বলল, তাই নাকি ! স্ট্রেঞ্জ !

কেন, স্ট্রেঞ্জ কেন ?

প্রসূনবাবুর কোন ডায়েরী খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ও। শ্রীমন্ত যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।—প্রসূনের ডায়েরী চুরি হয়ে গেছে ক'দিন আগে।

ডায়েরী! এত জিনিস থাকতে ডায়েরী ? শুভঙ্কর খুব অবাক হয়।—প্রসূনবাবুর ডায়েরীতে এমন কি মূল্যবান কথা লেখা ছিল মশাই ?

শ্রীমন্ত হাসির মত একটুখানি শব্দ করল।—তা মূল্যবান ডায়েরী তাতে সন্দেহ নেই। শ দুই টাকা ডায়েরীর ফোল্ডের মধ্যে ছিল। প্রসূনের ওই এক ব্যাড হ্যাবিট, সহজে আলমারী কিংবা দেরাজ খুলতে চায় না। ডায়েরীই ওর টাকা রাখার সহজ জায়গা ছিল। আমাদের চাকর রামচন্দ্র একেবারে ডায়েরী শুদ্ধু চক্ষুদান করে দিল। এই চুরির অপরাধেই ওকে তাড়ানো হল।

ক'দিন আগের ঘটনা ? শুভঙ্কর অন্যমনস্ক গলায় প্রশ্ন করে।

দিন তিন চার হবে।

কিছুক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলল না। শুধু থেকে থেকে সিগারেট টানার শব্দ আর একটা টাইমপিসের একটানা টিক টিক আওয়াজ ঘরের নির্জনতাকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলছিল।

আচ্ছা শ্রীমন্তবাবু, আজ আপনাদের বাড়িতে কোন মহিলা এসেছিলেন ?

মহিলা ? কই না তো!

প্রসূনবাবুর আর কেউ বান্ধবী আছে জানেন ? তপতী ছাড়া, বলাই বাহুল্য।

বান্ধবী কিনা জানি না ? একটি মেয়েকে আমি প্রসূনের কাছে আসতে দেখেছি।

কি তার নাম বলতে পারেন ? কোথায় থাকে ?

একটু ইতস্তত করে শ্রীমন্ত বলল, সত্যি বলতে কি কিছুই জানি না। এই একটা ব্যাপারে আমরা দূরত্ব রেখে চলতাম। কেউ কাউকে কোন

প্রশ্ন করতাম না। প্রসূন আমাকে নিজে থেকে মেয়েটি সম্বন্ধে কিছুই বলেনি, আলাপ করিয়েও দেয়নি। মেয়েটি এলে দেখতাম, ওর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাত।

দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন ছিল বলে আপনার ধারণা ?

সম্পর্ক বলতে ? ঘনিষ্ঠতা ?

স্যরি, না। আমি জানতে চাইছিলাম কোন হিচ্ চলছিল না তো দুজনের মধ্যে ? কোন ব্যাপার নিয়ে মতান্তর ? পাছে কোন তর্কাতর্কি আপনার কানে যায় সেইজন্যেই কি প্রসূনবাবু মেয়েটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতেন তাঁর ঘরে ?

শ্রীমন্ত একটু ভাববার চেষ্টা করল বিষয়টা। পরে মাথা নেড়ে বলল, না, ঝগড়া বা তর্ক কখনো কানে আসেনি তবে মেয়েটি এলে প্রসূন গম্ভীর হয়ে যেত।

শুভঙ্কর হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে টিপে নিভিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই শ্রীমন্তবাবু, আজ প্রসূনবাবুর কাছে কোন মেয়ে এসেছিল, এবং সম্ভবত হত্যাকাণ্ডটি ঘটার সময়ে সে উপস্থিত ছিল।

আপনি কি করে জানলেন ? বিস্মিত গলায় প্রশ্নটি করে শ্রীমন্ত নড়েচড়ে বসল।

আমি প্রমাণ পেয়েছি। শুভঙ্কর জানায়, প্রসূনবাবুর খাটের তলা থেকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি চন্দ্রমল্লিকার একটি থোকা, আর একটি মাথার কাঁটা। ফুলের থোকাটা খোঁপায় গোঁজা ছিল, খুলে পড়ে গিয়ে থাকবে। যেমন পড়ে গিয়েছিল প্রসূনবাবুর মুখের সিগারেট। তাঁর দেহের তলায় পড়ে সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল। সেই চেপ্টে যাওয়া সিগারেটটা আপনাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমার যায়নি।

তাহলে, আপনার কি মনে হয় এই হত্যা কোন স্ত্রীলোকের কাজ ?

না। তবে জড়িত হওয়া আশ্চর্য নয়। অর্থাৎ এই খুন স্ত্রীলোক-ঘটিত হতে পারে। আর সেইজন্যেই ডায়েরীটা কত প্রয়োজন ছিল

বুঝতে পারছেন? হয়তো রহস্যের একটা হদিশ পাওয়া যেত। নিদেন পক্ষে যে মেয়েটি আসত তার পরিচয়।

এখন বুঝতে পারছি রামচন্দ্র কত বড় ক্ষতি করেছে।

আচ্ছা, আপনাদের সারভেন্ট-কাম-কুক রামচন্দ্রের কোন ঠিকানা বলতে পারেন? তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম ডায়েরীটা উদ্ধার করতে পারি কিনা।

আজ্ঞে, ওর তো কোন ঠিকানাই নেই।

একটু কি ভাবল শুভঙ্কর, তারপর বলল, আপনার ঘুম পায় তো শুয়ে পড়ুন।

না, ঘুম পাচ্ছে না, তবে শুয়ে পড়তে পারি।

আলো নেভানো হয়ে গেলে শুভঙ্কর বলল, ঘুম তো পায়নি বললেন। তাহলে যদি খারাপ না লাগে, আপনি আজ দুপুর থেকে বিকেল অবধি, অর্থাৎ আমি আপনাদের কোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি যা দেখেছেন, যা যা ঘটেছে, যা করেছেন সব পরপর বলে যান। খুঁটিনাটি কিচ্ছু বাদ দেবেন না। কোন্‌টা অদরকারী, কোন্‌টা তুচ্ছ তা আপনার ভাববার দরকার নেই। আমি চোখ বুজে শুনি। কারণ অঙ্কটা বড্ড গোলমেলে ঠেকছে, কিছুতেই মিলছে না।

শ্রীমন্ত বলল, অলরাইট। আপনি শুনুন আমি বলছি—

একটু সময়ের নীরবতা, শুধু টাইমপীসটা যেন অকূল দরিয়ায় ভাসা স্টিমারের চাকার মত একটানা অন্ধকারে জল কেটে চলেছে।

বিকেলেই আপনাকে বলেছিলাম, শ্রীমন্ত হঠাৎ শুরু করল, আমাদের চাকর রামচন্দ্র কাজ ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে। তাই রান্নাটা আমরা নিজেরাই সেরে নিয়েছিলাম। মাংস রেঁধেছিলাম, আজ রবিবার কিনা, আমাদের দুজনেরই ছুটি ছিল। খাওয়া দাওয়ার পর প্রসূন প্রায় তক্ষুনি জামা প্যান্ট পরছে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি রে, কোথাও বেরোচ্ছিস নাকি? ও বলল একবার স্টেশনের দিকে যাবে, পাঠানকোট অ্যাটেণ্ড করতে। বুঝলাম, ওর পরিচিত কেউ আসছে

কিন্তু যেহেতু ও কিছু ভেঙে বলল না, আমিও তাই কৌতূহল প্রকাশ করলাম না। ছাত্র বয়স থেকেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা হলেও আমাদের বন্ধুত্ব একটু পিকিউলিয়ার ধরনের। একই সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এবং দূরত্ব বজায় রেখে আমরা চলে আসছি সেই প্রথম বয়স থেকেই। তাই আমি শুধু বললাম, আজ তপতীদের বাড়িতে টি-পার্টি আছে মনে আছে তো? শুভঙ্করবাবু যাবার পথে আমাদের ডাকতে আসবেন কিন্তু। ও ঘাড় নেড়ে জানাল মনে আছে। পরে বলল, পাঁচটার আগেই ও নিশ্চয় ফিরে আসবে। ও চলে যাবার পর আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে একটা গল্পের বই নিয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম। তুপুরে ঘুমোনো আমার অভ্যেস নেই তবু সামান্য সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ধড়মড় করে জেগে উঠেই দেখি পাঁচটা বাজে, বাইরে আলো মরে এসেছে। প্রসূন ফেরেনি দেখে ওর ওপর বিরক্ত হলাম। তারপর দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে, চা তৈরি করে খেয়ে জামা-কাপড় পরলাম। মনে মনে কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত বোধ করছি প্রসূন দেরী করছে দেখে। পাঠানকোট মানে জম্মু এক্সপ্রেস তিনটে নাগাদ তুর্গাপুরে আসে। আপ পাঠানকোট খুব কমই লেট করে, করলেও সামান্যই লেট করে। আমি বসবার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলাম আর আপনার এবং প্রসূনের তুজনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় আপনি এলেন, ঘড়িতে তখন ছটা বেজে পনের মিনিট। কম্পাউণ্ডের লোহার গেট খোলার শব্দ শুনে আমি বেরিয়ে এসে আপনাকে রিসিভ করলাম, মনে আছে নিশ্চয়!

শুভঙ্কর বলল, হ্যাঁ আছে। তবে একটা জিনিস বাদ গেছে, আপনি সিগারেট খেতে খেতে কাগজ পড়ছিলেন। অ্যাশট্রের ওপর আপনার সিগারেট পুড়ছিল আমি লক্ষ্য করেছি। এনি ওয়ে, এটা আমি বললাম এই জন্যে যে অনেক তুচ্ছ জিনিস আপনারা কি ভাবে ছেড়ে যান সেইটে দেখাবার জন্যে।

শ্রীমন্ত ছোট একটুখানি হাসির মত শব্দ করে বলল, ওঃ আপনি তো মশাই সত্যিই ডেঞ্জারাস!

সকালবেলার চা খেয়েই শ্রীমন্ত চলে গিয়েছিল। আজ শ্রীমন্তর অনেক কাজ, অফিস যেতে হবে, কয়েক দিনের ছুটির ব্যবস্থা করা দরকার। আজ বিকেল নাগাদ প্রসূনের মৃতদেহ পুলিশ মর্গ থেকে ফেরত পাওয়া যাবে। সুতরাং সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রীমন্ত চলে যাবার পর শুভঙ্করও বেরোবার উদ্যোগ করছিল।

কোথাও বেরোচ্ছ নাকি ঠাকুরপো?

হ্যাঁ কাজ আছে।

কি কাজ?

গলার স্বর শুনে সন্দেহ হতেই মুখ তুলে তাকাল শুভঙ্কর। মেজবৌদির ঠোঁট টেপা হাসিটা লুকোবার আগেই দেখতে পেয়ে গেল—হাসছ যে?

কৃত্রিম গম্ভীর গলায় বৌদি বলল, কাজের জন্যে তোমাকে আর ছুটতে হবে না, কাজ নিজেই তোমার দরজায় পৌঁছে গেছে। বসবার ঘরে গিয়ে দেখগে যাও। আর এক রাউণ্ড চা খাবে, না কফি?

বসবার ঘরে ঢুকতেই তপতী চমকে উঠল। দু'হাতের মধ্যে মুখ রেখে এতক্ষণ সম্ভবত ও কাঁদছিল। শুভঙ্কর সোজাসুজি তপতীর দিকে তাকাল না।

ও তো এইমাত্র চলে গেল। কথাটা বলে শুভঙ্কর বসল না, দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

কে চলে গেল? তপতী চোখ তুলে তাকাল।

তপতীর মুখের দিকে তাকাল শুভঙ্কর। গলার স্বরই শুধু ভেঙে যায়নি, তপতীর চেহারাও যেন ভেঙে গেছে অনেকখানি। মুখ চোখ কেমন ফ্যাকাশে, প্রাণহীন, চোখের কোলে যেন কালি। এক রাতের মধ্যে এতখানি পরিবর্তন!

শ্রীমন্তর কথা বলছিলাম। কাল রাতে এখানেই ছিল কিনা।

শুভদা! তপতী নিজেকে সংযত করে নিতে একটু সময় নিল, তুমি অন্তত আমার সঙ্গে আজ এ রকম ব্যবহার কর না!

শুভঙ্কর লজ্জা পেল, নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হল। সত্যি,

তপতী আজ বড় অসহায়, ভেতরে ভেতরে বুঝি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কাপুরুষ না হলে এ অবস্থায় কেউ আঘাত করতে পারে না।

তপতী সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল মনের আবেগে। শুভঙ্কর সহানুভূতির সুরে বলল, বস তপু। এ কি চেহারা হয়েছে তোমার! রাত্রে ঘুমোতে পারনি নিশ্চয়। তারপর নিজে বসে ফের বলল, বোস! দাঁড়িয়ে রইলি কেন। তুই এসেছিস ভালই হয়েছে, নইলে আমাকেই—ও কি?

চোখে টলটলে দুফোঁটা জল এসে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে সোফার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে পড়ল তপতী। আধাআধি হাসিকান্নায় মেশা গলায় বলল, ও কিছু না।

শুভঙ্কর বলল, হ্যাঁ, দ্যাট্স রাইট। মনকে শক্ত করতেই হবে। দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে এ রকম নিষ্ঠুর ভাবেই আসে। কিন্তু এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, এর পিছনে মানুষের হাত আছে। সেই হাত খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে তাকে। আর এই কাজে তোর সাহায্যও আমার চাই।

শুভঙ্করের অকৃত্রিম এবং অন্তরঙ্গ ভঙ্গি তপতীকে আবার স্বাভাবিক করে তুলছিল। সে বলল, আমি মেয়ে হয়ে তোমাকে আর কতটুকু সাহায্য করতে পারি, শুভদা? আমার সাহায্য তোমার কোন কাজেই লাগবে না। লাগবে লাগবে। শুভঙ্কর আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসল, তুই আমার কি কাজে লাগবি সে তুই নিজেই জানিস না। হয়তো বুঝতেই পারবি না।

কিন্তু আমরা যেন জানতে পারি। মেজ বৌদি দু'কাপ কফি নিয়ে কখন ঘরের মধ্যে চলে এসেছিল শুভঙ্কর টের পায়নি, এক্সকিউজ মি ঠাকুরপো, তোমাদের কফি দিতে অনধিকার প্রবেশ করতে হল।

শুভঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পেয়ালা দুটো বৌদির হাত

থেকে নিতে নিতে সহাস্যে উত্তর দিল, চিন্তা কর না বৌদি, সত্য কখনো গোপন থাকে না।

বৌদি চলে যেতে শুভঙ্কর হাসল, কিছু মনে করিস না তপু। বৌদিকে কিছুই বলিনি আমি। আমার বোধহয় এই রকম স্বভাব। কাল রাতে শ্রীমন্ত এখানে খেয়েছে, ঘুমিয়েছে অথচ বাড়িতে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি শুধু আমার বন্ধু বলে। এর বেশী কিছুই বলিনি। বললে, আমার কাজের ক্ষতি হত, শ্রীমন্তও হয়তো খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়ত, কৌতূহলের খোরাক যোগাতে যোগাতে। তোর ব্যাপারটাও তাই, মেজবৌদি স্পষ্ট করে আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না, ও এ সংসারেই এসেছে মাত্র দু'বছর। যাকগে ওসব—

শুভদা! কিছু আন্দাজ করতে পারলে হত্যাকারী সম্বন্ধে? এই মার্ডারের মোটিভটাই বা কি, আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না।

অ্যাই! জট তো ওইখানেই পাকিয়ে রয়েছে। তোর সঙ্গে কথা এই জন্যই দরকার। প্রসূন সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ওর ব্যাপারে হয়তো তুই কিছু আলোকপাত করতে পারিস।

মুখ নিচু করে তপতা দু'চুমুক কফি খেল, কে জানে হয়তো এক পলকের জন্য লজ্জা বোধ করল। তারপর বলল, কিন্তু মানুষটা খুব চাপা ছিল শুভদা। কম কথা বলত, নিজের সম্বন্ধে আরও কম। তাই তোমাকে বেশী কিছু বলতে পারব বলে মনে হয় না। শ্রীমন্তবাবু বরঞ্চ—

কফির কাপ সেণ্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাচ্ছিল শুভঙ্কর, মাথা এবং কাঁধের ভঙ্গি করে থামিয়ে দিল তপতীকে, পরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, জানি, শ্রীমন্ত যতটুকু জানে বলেছে। কিন্তু দুটো মানুষের অ্যাঙ্গেল অফ ভিশন এক হয় না, বিশেষ করে একজন পুরুষ আর মেয়ের। তুই যা দেখবি শ্রীমন্ত তা দেখতে পাবে না, ও যা দেখবে তুই দেখতে পাবি কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে একজন বন্ধুর পক্ষে বন্ধুর পুরো চেহারা দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

বেশ তো বল, কি জানতে চাও।

কিছুদিন থেকে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলি প্রসূনের আচার আচরণে ?

কই না।

তুই শেষ কবে ওকে দেখেছিস ?

ওই যে তোমাকে নিয়ে সেদিন ওদের ওখানে বেড়াতে গেলাম।

সেই শেষ ? আর যাসনি ? আচ্ছা, প্রসূনের কোন নেশা ছিল ? আই মীন হবি ?

তপতী একটু চিন্তা করে বলল, নেশা বলতে সিগারেট। আর কিছু বলে তো জানি না। অনুরোধ উপরোধে পড়ে কখনো এক-আধটু ড্রিংক করেনি তা নয়, কিন্তু সে তো নেশা নয়। আর হবি বলতে কিছু বলে মনে পড়ছে না।

পড়ছে না ? শুভঙ্কর সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে অন্যমনস্কভাবে ভ্রূ-কোঁচকাল, অতি তুচ্ছ অতি কমন এমন কিছুও মনে পড়ছে না ? যেমন ধর, ডায়েরী লেখার হ্যাবিট ছিল, তাই না ?

ওঃ হ্যাঁ। সে-রকম দু-একটা তোমাকে বলতে পারি, কিন্তু তার সঙ্গে এই হত্যার কিংবা হত্যাকারীর কোন সম্বন্ধই থাকতে পারে না।

তোর কাজ তুই কর, বলে যা—

বই কেনা, লটারীর টিকেট কেনা, যুদ্ধের সিনেমা দেখতে ভালবাসা, ফাউন্টেন পেনে নানা রঙের কালি ব্যবহার করা, এই সব বিষয়ে ঝোঁক ছিল। কিন্তু শুভদা, এসবের মধ্যে আর কি রহস্য আছে, বল ?

হুঁ ! শুভঙ্কর অ্যাশট্রের মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেটটা টিপে নেভাতে নেভাতে বলল, এখন অন্তত কিছুই রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা তপতী, কিছু মনে করিসনে, একটা কথা বলব। প্রসূনের আর কোন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল, জানিস ?

বান্ধবী ? ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ? উহুঁ ! থাকলে ও নিশ্চয় আমাকে বলত। ও চাপা ছিল শুভদা কিন্তু এই একটা বিষয়ে ওর খুব বিবেক বোধ ছিল।

কিন্তু আমি জানতে পেরেছি একটি মেয়ে ওর কাছে মাঝে মধ্যে আসত।

তপতী চুপ করে রয়েছে দেখে শুভঙ্কর নরম গলায় বলল, আহা, এটা কিছু গুরুতর ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়। বান্ধবী বা প্রেমিকা ছাড়াও কত মেয়ে কত স্বাভাবিক প্রয়োজনে আমাদের কাছে আসতে পারে। প্রসূনের কাছেও সেই রকম দরকারে কেউ হয়তো আসত। শুধু একটু অস্বাভাবিক ঠেকেছে এই কারণে যে, প্রসূন সেই মেয়েটির সঙ্গে শ্রীমন্তকে কখনও পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

তপতী বলল, একটি মেয়ে ওর কাছে কখনো-সখনো আসত আমি জানি।

শুভঙ্কর অবাক চোখে তাকাল, তুই জানিস। দেখেছিস তাকে ?

না। ও-ই আমাকে বলেছিল। বলেছিল পরে ওর সম্বন্ধে আমাকে সব বলবে। এখনো নাকি বলার সময় আসেনি। তবে মেয়েটির সঙ্গে যে ওর কোন রকম সম্পর্ক নেই সে কথা পরিষ্কারই বলেছে।

মেয়েটার নাম কি ? কোথায় থাকে জানিস ?

কোথায় থাকে জানি, তবে ঠিকানা নয়। আর নামও জানি না। শুনেছি দক্ষিণেশ্বরে ওর বাড়ি।

ইতস্তত করে শুভ বলে, শোন তাহলে, প্রসূনের ঘরে আমি একটা রূপোর কাঁটা কুড়িয়ে পেয়েছি।

মাথার কাঁটা ?

হ্যাঁ। সেই সঙ্গে টাটকা ফুল। খোঁপায় গোঁজা ফুল, যতদূর মনে হয়।

জল ভরা চোখে তপতী বলল, আমাকে সন্দেহ করছ শুভদা ? জেনে রাখ, মাথায় রূপোর কাঁটা আমি জীবনে ব্যবহার করিনি। খোঁপায় ফুল গোঁজাও আমার স্বভাবের বাইরে। বলেই তপতী উঠে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শুভ পিছন থেকে ডাকল, তপতী! তপতী পাগলামো কর না, শোন—

এই যে স্যার আপনাকেই খুঁজছিলাম। থানার ও. সি শুভকে দেখেই অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন, আসুন।

নতুন কোন খবর আছে? ও. সি-র মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসল শুভ।

সেই জন্যেই তো আপনাকে খুঁজছি। আপনার কথা মত প্রসূন-বাবুর ভাগ্নের খোঁজ চালিয়েছিলাম হাবড়ার থানা মারফৎ। খোঁজ মিলেছে।

কোথায় আছে শ্রীমান? আজকের মধ্যেই কনট্যাক্ট করতে পারলে ভাল হত।

স্বচ্ছন্দে। আপনি স্যার, ইচ্ছে করলে এখুনি কথা বলতে পারেন।

অ্যাঁ! কোথায় সে?

লক-আপে। আজ সকালেই অ্যারেস্ট করে এনেছি। কৃতিত্বের হাসি হাসলেন ও. সি, এত তাড়াতাড়ি যে কেসটার মীমাংসা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।

বলেন কি! একেবারে অ্যারেস্ট করে এনেছেন! কিসের অপরাধ?

আপনি ঠাট্টা করছেন স্যার। ওই ছোকরা ছাড়া প্রসূনবাবুকে কে হত্যা করবে!

মোটিভ! কোন প্রমাণ আছে আপনার হাতে?

মোটিভ তো অতি পরিষ্কার। ইনসিওরের মোটা টাকা ওর হাতে আসবে। আজকালকার বেকার ছোঁড়াদের মেজাজ তো জানেন, পান থেকে চুন খসলেই মাথায় খুন চেপে যায়। লাস্ট টাইম ছিচের কথাও ছোকরা স্বীকার করেছে।

কিন্তু ও যে প্রসূনকে খুন করেছে সেটা তো প্রমাণ করতে হবে?

হোয়াই শুড আই ? ওকেই প্রমাণ করতে হবে যে ও খুন করেনি। করুক প্রমাণ। কেস এমন সাজাব যে চোখে সর্ষে ফুল দেখবে। তখন দাওয়াই পড়লে আপনিই কবুল করবে। কত ঝানু ক্রিমিন্যালকে দেখলাম, ও তো শিশু! নিন স্যার, চুরুট খান, এ ক্লাস চুরুট, খাঁটি বর্মা থেকে আমদানী।

থ্যাংকস! চুরুট আমার সহ্য হয় না—বলে পকেট থেকে সিগারেট বের করল শুভঙ্কর, কিন্তু আমি ভাবছি একটি নিরীহ ছেলে না শেষ পর্যন্ত আপনার ফাঁসি কলে ঝুলে যায়। কেস সাজাবার আগে আর একটু খোঁজ খবর নিন।

নিরীহ ? ওই ছোকরা নিরীহ! ওকে কি ভাবে গ্রেপ্তার করেছি যদি জানতেন। আমাদের একজন কনস্টেবলকে তো শেষ করেই দিয়েছিল আর একটু হলে। সাগরডাঙা কলোনীর কাছে একটা বাড়ি যখন রেড করি, হরিপদ তখন নেশায় চুর, তার সাঙ্গোপাঙ্গোর অবস্থাও সেই রকম। কিন্তু পুলিশের গন্ধ যেই পেয়েছে অমনি ফণা তুলেছে। ড্যাগার আর পাইপগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, হাত পা স্টেডি ছিল না তাই রক্ষে। 'এদের নিরীহ বলা যায়, স্যার!

আই সী।

আরও আছে স্যার। হাবড়ায় যার বাড়ি সে দুদিন যাবত দুর্গাপুরে বসে কি করছিল বলতে পারেন? হাবড়া থানা ইনফরমেশন নিয়ে আমাকে জানাল শ্রীমানের বাড়ির লোকে বলছে উনি গতকাল দুর্গাপুরে গেছেন মামার সঙ্গে দেখা করতে। অথচ রিপোর্ট এই, কাল বিকেল পর্যন্ত হরিপদকে শর্ট রোডের বাংলোয় আসতে দেখা যায়নি। তবে কাল রাত নটা নাগাদ শ্রীমান মোটর সাইকেলে করে শর্ট রোডে এসেছিল, কিন্তু পুলিশ গার্ড দেখে আর ভেতরে ঢোকেনি, উঁকিঝুঁকি মেরেই সরে পড়েছিল। কিন্তু জানত না সাদা পোশাকেও আমার লোক রয়েছে। তারা ফলো করে বাড়ি দেখে এসে থানায় রিপোর্ট করে। এই হচ্ছে কালকের কাহিনী।

চোখ বুজে শুভঙ্কর সিগারেট টানছিল, হঠাৎ ধড়মড় করে সোজা

হয়ে বসে বলল, ইয়েস, হয়েছে। মোটরসাইকেল, মোটরসাইকেল, ইস, আগে আমার মাথায় আসেনি কেন!

থানা অফিসার মিঃ সাহা খানিকক্ষণ অবাক চোখে শুভর দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, যদি তামাশা না করে থাকেন স্যার, তাহলে আপনার হেঁয়ালীর মধ্যে কি আমি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি না?

শুভ হেসে ফেলে বলল, না, রহস্য নয়, এখন পাচ্ছেন রহস্য উন্মোচনের গন্ধ। প্রসূনবাবুর হত্যার অস্ত্রটা বোধহয় আমি চিনতে পেরেছি। বাই দি বাই, ময়না তদন্তের রিপোর্টটাই শোনা হল না যে!

আপনি স্যার, রহস্য উপন্যাসের লেখকদের মতই। সাসপেন্সে চাপিয়ে মই কেড়ে নেন।

সিগারেট সুদ্ধু হাতটা বরাভয়ের ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলে শুভ বলল, হবে হবে। আগে রিপোর্টটা শোনান তো?

ও. সি একটা ফাইল টেনে নিয়ে রিপোর্টটা পড়ে শোনালেন। সামান্য কয়েকটি তথ্য এবং নতুন কিছুও নয়। অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত নয়। ঘাড়ে প্রচণ্ড একটি আঘাত লেগে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছে। আঘাতটা করা হয়েছিল স্টীলের পাত জাতীয় কিছু দিয়ে যার গায়ে খাঁজ কাটা ছিল। আঘাতের জায়গায় গ্রীজের আবছা চিহ্ন পাওয়া গেছে। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মৃত সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ ছিল। মৃত্যুর সামান্য আগে চা এবং মাখন রুটি খাওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে বলা যায় ছ'টা থেকে সাতটার আগে পরে এই ঘটনা ঘটেনি। অর্থাৎ হত্যার সময়টা স্থির হয়েছে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে।

রিপোর্ট শোনবার সময় ঠোঁটে সিগারেট রেখে চোখ বুজে ছিল শুভ, এইবার চোখ খুলল।—গ্রীজ, খাঁজ কাটা দাঁতের চিহ্ন—সবই কাল আমি লক্ষ্য করেছিলাম। গ্রীজটা কার্বন কালো, মোটর বা মোটরসাইকেলে যে ধরণের গ্রীজ ব্যবহার করা হয়। অথচ তখনও

পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। হ্যাঁ, রেঞ্চ দিয়েই প্রসূন-বাবুর ঘাড়ে আঘাত করা হয়েছিল।

ইউরেকা! ইউরেকা! তবে তো হয়েই গেল। মার্ডারার্স ওয়েপ্‌নটাও পেয়ে গেলেন। হত্যাকারীর হাতিয়ার। ইউরেকা! নিভে যাওয়া চুরুটে টান দিয়ে উত্তেজনাবশত কাল্পনিক ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন মিঃ সাহা।

হঠাৎ স্বর পাল্টে খিঁচেকড়া একটা ধমক লাগাল শুভঙ্কর, দাঁড়ান মশায়, অত সহজেই কি ইউরেকা হয়! ওই মস্তান ছোকরাকে আগে দেখতে দিন।

গার্ড লক-আপের তালা খুলে দিল। তালা খোলার শব্দে মুখ তুলল ছেলেটি। বয়স বাইশ হবে, কিন্তু মুখে কমনীয়তা নেই, কঠিন পোড় খাওয়া চেহারা। জোড়া ভুরু, ম্যাক্সি জুলপি, করমচার মত লাল চোখ দুটোই প্রথমে নজরে পড়ে। পরে আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুই। লম্বা ধাঁচের শক্ত চেহারা জড়িয়ে বেল বেটম্, চক্রাবক্রা বুশ শার্ট, লম্বা চুল। বিপদের গন্ধ পেয়ে হিংস্র প্রাণীর মতই সজাগ খাড়া হয়ে বসল হরিপদ, বিরক্ত চোখে তাকাল শুভর দিকে। হয়তো দৃষ্টিতে ঘৃণাও মাখানো ছিল।

তোমার নাম হরিপদ? হরিপদ কি?

হরিপদ শুভঙ্করের আপাদমস্তক এক নজর দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল, কোন কথা বলল না। শুভ সামান্য অপেক্ষা করে ফের বলল, কই, উত্তর দিলে না?

ছোবল মারার ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল হরিপদ, ডায়েরী বুকে বানান করে করে লিখিয়ে দিয়েছি মশাই, একটু কষ্ট করে পড়ে নিন গে যান। গলার স্বর বেশ রুক্ষ আর ঝাঁজ মেশানো।

তুমি ভাই খুব রেগে আছ দেখছি। শুভ ওর কম্বলেরই এক-পাশে বসে পড়তে পড়তে বলল, আমাকে তো বসতেও বললে না ভাই?

ভাই! রাবড়ি জ্বাল দিতে এলেন বুঝি, দাদা! তবে ভুল

করেছেন, ওসব পুলিশী র‍্যালা দিয়ে এ শর্মার কাছ থেকে কোন গল্প বেরোবে না, আগে থেকেই সাফ শুনে রাখুন।

হরিপদর কথায় শুভ চটে উঠল না, এসব ছেলের সাইকোলজি তার জানা আছে। সিম্প্যাথী বা সহানুভূতিকেই এরা সবচেয়ে সন্দেহের চোখে দেখে, বলতে কি ভয় করে। সামান্য হেসে শুভ বলল, আমি পুলিশ হিসেবে তোমার কাছে আসিনি ভাই, তোমাকে দিয়ে কোন গল্প বলিয়ে নেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়।

ভুরু কপালে তুলে কথা বলল হরিপদ, তবে কি হিসেবে এসেছেন? কি উদ্দেশ্যে? নিশ্চয় শালা ভগ্নিপোতের মধুর সম্পর্ক পাতাতে আসেননি স্যার?

শুভ আর হাসল না, ধীর গলায় বলল, সত্যকে জানা এবং জানানোই আমার কাজ।

ওরে গ্‌গুরু! এ যে ফুল সাইজ ডিটেক-টিভের বয়ান ছাড়ছেন, স্যার! নভেলে এ রকম কথা লেখা থাকে দেখেছি। কথাটা বলে নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাস্য করে উঠল হরিপদ।

তোমার মামা মারা গেছেন কাল সন্ধ্যায়, জানো নিশ্চয়?

সামান্য ঘাড় হেলাল হরিপদ।

খুন হয়েছেন।

জানি। মামা খুব লাকি।

কেন, লাকি কেন?

আমার সঙ্গে মোকাবিলা হল না। আমি কড়কে দেবার আগেই কেটে পড়ল মামু আমার। কথার শেষে উন্মাদের মত হাসতে লাগল।

ম্যানড্রেকস্ না সিদ্ধি, শুভ হরিপদর চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল, এ হাসি কতদিনের?

হাসি থামিয়ে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল হরিপদ, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শুভঙ্করের মুখের দিকে। অনুমান করা শক্ত নয় তার ভেতরে কিছু একটা হচ্ছে।

তোমার মামা লাকি কিনা জানি না হরিপদ, তবে তুমি যে লাকি এটা বোধহয় তুমি নিজেও জানো না।

কেন, লাকি কেন? হরিপদর মুখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল।

তোমার মামা খুনের হাত থেকে বাঁচতে পারেননি কিন্তু তুমি পেরেছ। একটুর জন্যে তুমি একটা মারাত্মক ক্রাইমে জড়িয়ে পড়নি।

জড়িয়ে পড়িনি আপনি কি করে জানলেন? হরিপদ হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু হাসিটা শুকনো কাসির মত শোনাল, আমাকে কি তবে পদ্মশ্রী দেবার জন্যে হাজতে পুরেছে?

হরিপদর কথার কোন উত্তর না দিয়ে শুভ তার আগের কথাটারই জের টানল, তাছাড়া তুমি শিগগীরই প্রসূনবাবুর পঁচিশ হাজার টাকার মালিক হতে চলেছ।

হুঁ! যতই লোভ দেখান মশাই, আমাকে আর আপনি মুখ খোলাতে পারছেন না। বলে হরিপদ সত্যি সত্যি শুভঙ্করের দিকে পিঠ ঘুরে বসল। মনে হল সত্যিই তাকে দিয়ে আর কথা কওয়ানো যাবে না।

আমিই তোমাকে এই কথা বলতাম। ভালই হল। শুভঙ্কর খাটো গলায় বলল, এই মুহূর্ত থেকে তুমি স্রেফ বোবা সেজে থাক। সিম্প্‌লি নন-কমিট্যাল। কোন মন্তব্য না, স্বীকারোক্তি না, সই না। অনেকে হয়তো অনেক কথা বলিয়ে নেবার চেষ্টা করবে তোমাকে দিয়ে, কিন্তু তুমি মনে রাখবে তোমার কথাই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। তোমার একটি অসাবধান সেনটেন্স্‌ তোমার ডেথ্‌ সেনটেন্স্‌ হয়ে ফিরে আসতে পারে। আচ্ছা চলি, সাবধানে থেকো, হরিপদ।

শুভঙ্কর চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, হরিপদ মুখ ফিরিয়ে ডাকল, শুনুন।

আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে শর্ট রোডে গেল শুভঙ্কর। সব ব্যাপারটাই কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে রয়েছে এখনো। সব

সূত্রগুলো এলোমেলো টানাপোড়েনে কেমন জট পাকিয়ে রয়েছে, সুতোর আগা কিংবা গোড়া কোনটাই ধরতে পারা যাচ্ছে না।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল শুভ, ইস, অনেকখানি সময় ইতিমধ্যেই সে নষ্ট করে ফেলেছে, বেশী সময় হাতে নেই। শেষবারের মত শ্রীমন্তদের কোয়ার্টার আর একবার তল্লাস করে দেখতে হবে। যদি সামান্য একটু কিছুও তার নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকে। যদি সামান্যতম কিছুও অকুস্থলে ফেলে গিয়ে থাকে হত্যাকারী। ও বাড়ির কোথাও কোন কিছু অস্বাভাবিক ঠেকে কিনা এই বেলা দেখতে হয়। কাল রাত থেকে বাংলোটা খালিই পড়ে ছিল। এখনো মানুষের বসবাসে, চলায় ফেরায় কোন ছাপ কোন চিহ্ন হয়তো মুছে যায়নি। শ্রীমন্ত ফেরার আগেই, প্রসূনের শবযাত্রীদের ভিড় জমে ওঠার আগেই চোখ কান মন খুলে আবার হাতড়ে বেড়াতে হবে গোটা বাংলো। যদি কোন লিংক পাওয়া যায়।

ডুপ্লিকেট চাবি নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল কাল থেকে। আপনা থেকেই হঠাৎ হাসি এসে গেল শুভঙ্করের ঠোঁটে। অপরাধের জায়গায় কেবল অপরাধীকেই দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে হয় না, অপরাধীর পার্টনারকেও আসতে হয়।

গত সন্ধ্যের কথা শুভর মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দৃশ্যগুলো পর পর সিনেমার শটের মত চোখের ভেতরে লুকনো কোন পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল।

চাবি দিয়ে ডোর ল্যাচ্ খুলে বসবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই শুভঙ্করের পুরোনো ছবি দেখা হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখল সেণ্টার টেবিল সেই রকমই আছে। দুটো অ্যাশট্রের একটির ওপরে তালাক দেওয়া, ছাই-জমা সিগারেট, অন্যটার তলা থেকে চিঠিটা অদৃশ্য। সেণ্টার টেবিলের একপাশে সান্‌ডে স্টেট্‌সম্যানখানা ভাঁজ করা রয়েছে। অন্যমনস্ক কৌতূহলে কাগজখানা তুলে নিয়ে পাতা খুলল, পাতা ওল্টাল, নিউজ হেডিংগুলোয় নজর বুলিয়ে চলল। হঠাৎ ভেতরের একটা পাতা

খুলতেই তার ভ্রূ জোড়া আধইঞ্চিটাক কপালের ওপর উঠে গেল এবং সেখানেই স্থায়ী হল, কপালে ভাঁজ পড়ল গোটা দুই।

কাগজের পাতার ভাঁজে হলদে কাগজে ছাপা একখানা হ্যাণ্ডবিল। বেনাচিতির বাজারে কেউ নতুন উলের দোকান খুলেছে তার বিজ্ঞাপন। নতুনত্ব কিছুই নেই, মফস্বলে ইদানীং হ্যাণ্ডবিল বিলি করার এই টেকনিক পুরনোই হয়ে গেছে বলা যায়। কিন্তু শুভঙ্করের তাতে কিছু আসে যায় না। কাগজের ভেতর হ্যাণ্ডবিলটা পেয়ে গিয়ে তার ঝোঁক চাপল পুরোনো খবরের কাগজগুলো দেখার।

ভেতরের বারান্দার একপাশে ছিল ভাঁড়ার ঘর। সেখানে থরে থরে কয়েক মাসের খবরের কাগজ জমা করা ছিল। সেই স্তূপের ওপর থেকে কয়েকখানা কাগজ তুলে নিয়ে, তারিখ মেলাচ্ছিল আর পাতা খুলে দেখছিল। তারিখ অনুযায়ী পর পর রাখা ছিল। কিন্তু মজা এই গত পরশু দিনের কাগজখানা খুঁজে পাওয়া গেল না। এঘর ওঘর, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু নেই—ওই দিনের কাগজ যেন কি কৌশলে হাওয়া হয়ে গেছে।

অগত্যা কাগজের চিন্তা বাদ দিয়ে শুভ প্রসূনের ডায়েরী দেখতে লাগল। আগের আগের কয়েক বছরের ডায়েরী তাকের ওপর সাজিয়ে রাখা আছে, শুধু এই বছরের খানা নেই। ডায়েরীগুলো উল্টে-পাল্টে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু সম্প্রতিকালের কোন তথ্যই তার মধ্যে নেই, কোন বান্ধবীর কথা নেই।

গোটা বাড়িটার সব ঘরগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজেও নতুন কিছুই পেল না। প্রসূনের আলমারীর মধ্যে একটা শৌখীন কাঁচের গ্লাসের মধ্যে আট-দশটা দামী কলম দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তপতীর কথা মনে পড়ল। তপতী বলেছিল, প্রসূনের নানা রঙের কালির ওপরে দুর্বলতা ছিল, কথাটা দেখা যাচ্ছে সত্যিই।

আসলে কাগজে কলমে প্রসূন ছিল একেবারে ব্যালন্সাড, এবং হয়তো ইচ্ছে করেই ম্যাটার অব ফ্যাক্ট। শুভঙ্কর আপন মনেই হাসল, হয়তো হাউসমেট শ্রীমন্তকে মনে রেখেই প্রসূনের ছিল এই

সাবধানতা। হৃদ্‌রোগ ব্যাপারটা যত গোপন থাকে ততই মঙ্গল। কিন্তু একটা জিনিস একটু আশ্চর্য লাগছে, দ্বিতীয় কোন নারীর ইংগিত-উল্লেখ কোথাও নেই। প্রসূন যেভাবে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় লিখে রাখে তাতে অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকলে কিংবা কোন মেয়ে তার কাছে এলে তার উল্লেখ থাকবে না এ হতেই পারে না। অবশ্য একটা পসিবিলিটি আছে, মেয়েটির সঙ্গে হয়তো খুব বেশীদিন আলাপ হয়নি, হয়তো এ বছরের আগে সাক্ষাৎকার হয়নি তার সঙ্গে।

ফিরে আসার মুখে হঠাৎ বসবার ঘরে ঢুকে বিস্মিত শুভঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘরের একপাশে দেয়ালের ধারে একটি ছোট্ট-প্রাণী মুখটা ওপর দিকে করে পিছনের দুটি পা আর লেজে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক পা এগিয়ে প্রাণীটাকে সনাক্ত করতে পারল। একটি হৃষ্টপুষ্ট সাদা ইঁদুর।

শুভ অবাক হল। সাদা ইঁদুর এ বাড়ির মধ্যে কি করে এল! এই জাতের ইঁদুর সাধারণত পোষাই হয়, গৃহপালিত, মাঠে-ঘাটে জঙ্গলে থাকে না। লোকে নেংটি ইঁদুরের উৎপাত দূর করার জন্যে এদের পুষে থাকে।

হাত বাড়িয়ে ইঁদুরটাকে ধরতে যেতেই সেটা ছুটে পালাল। করিডোরে বেরিয়ে উল্টোদিকে স্টোর রুমে ঢুকে পড়ল, কিন্তু সুইচ বোর্ডের আশেপাশে ওপরে নিচে কোথাও কিছু চোখে পড়ল না। ইঁদুরটা তাহলে এখানে কি করছিল? কিছু একটা করছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কি সেটা।

পকেট থেকে একটা শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। শুভঙ্করের কপালে একটা রেখা ফুটে উঠল। দেওয়ালের গায়ে ইঁদুরের সামনের পায়ের আবছা ছাপ রয়েছে। ছাপগুলো একদিনের নয়, কেননা কোনটি তেলা পায়ের কোনটা বা ছাই বা ময়দা জাতীয় কিছুর। দেওয়ালের তলার সিমেন্টের বর্ডারের গায়ে ছাপগুলো প্রায় একই জায়গায়। ওখানে বসেই

ওপরের দিকে মুখ তুলল শুভঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে তার মগজের মধ্যে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল।

বেনাচিটি বাজারের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শুভঙ্কর। হঠাৎ একটা মনোহারী দোকানে চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল। সেকেণ্ড কয়েকের অনিশ্চয়তার পরেই পরিষ্কার মনে করতে পারল এই মুখ সে কোথাও দেখেছে। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে সে খুশি না হয়ে পারল না। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে লোকটার হাত চেপে ধরল শুভ, এই যে বাবা রামচন্দ্র, শেষ পর্যন্ত আমার হাতেই ধরা পড়লে !

বেজায় চমকে গিয়ে লোকটা শুভর মুখের দিকে তাকাল। শুভকে মাত্র একদিন ঘণ্টাখানেকের জন্যে দেখলেও বিলক্ষণ মনে ছিল রামের। কারণ পুলিশকে কে না মনে রাখে। সেদিন তপতী দিদিমণি নিজে মুখেই বলেছিল, দেখ বাবা রামচন্দর, চা'টা যেন ভাল হয়, পুলিশ সাহেব আবার কড়া লোক। চা খারাপ হলে ওনার মেজাজ খাপ্পা হয়ে যায়।

চিনতে পেরেই কালো মুখখানা প্রথমে বেগুনী পরে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। প্রায় ককিয়ে উঠল রামচন্দ্র, বিশ্বেস করুন ছার, ঘড়ি আমি নিই নাই।

ঘড়ির উল্লেখ ঠিক ধরতে পারল না শুভঙ্কর কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে শুধু বলল, হুঁ ! নিয়েছ কি না সেটা বের করতে বেশী সময় লাগবে না। হাজতে ঢোকালেই পেটের কথা সব আপসে বেরিয়ে আসবে।

রামচন্দ্র ছোকরা মানুষ, বয়স বেশী হলেও উনিশ কি কুড়ি হবে। ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল, সাহেব, আপনার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দ্যান। গরীব মানুষ, বিধবা মা না খেতে পেয়ে মরে যাবে, ছার।

কৌতূহলী মুখে আরও দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শুভঙ্কর তাদের দিকে ফিরে ঠাণ্ডা গলায় বলল, কিছু হয়নি, আপনারা নিজের কাজে যান। তারপর রামের হাতটা দিয়ে ছেড়ে নরম গলায় বলল, ভয় নেই, কিছু করব না, আয় আমার সঙ্গে।

একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে শুভঙ্কর বলল, আমাকে যদি সব খুলে বলিস, তোর কোন বিপদ হবে না। কথা দিলাম।

নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে রামচন্দ্র শুভঙ্করের নানা প্রশ্নের জবাবে ভেঙে ভেঙে যে কাহিনী জানাল তা জুড়লে এই রকম দাঁড়ায়। শুভকে নিয়ে তপতী যেদিন শর্ট রোডের বাংলোয় বেড়াতে গিয়েছিল তার পরদিন বিকেলে প্রসূনবাবুর ঘড়িটা উধাও হল। সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না। তারপর রাতে বাবুর ডায়েরীটাও নিখোঁজ হল। ওটার মধ্যে নাকি টাকা ছিল। বাবু তো একেবারে আগুন। ওকে পুলিশে দেবেন বলে শাসালেন। ভয়ে রাম চুপচাপ পিঠটান দিল ওখান থেকে। কদিন অনেক কষ্টে কাটাবার পর বেনাচিটি বাজারের কাছে একটা বাড়িতে কাজ পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল, এবার বুঝি সে চাকরিও যায়! সে চোর একথা যদি প্রচার হয়ে যায় তো কোথাও আর কাজ জুটবে না।

শুভ আরও দু-পাঁচটা প্রশ্ন করে তার জ্ঞাতব্য মোটামুটি জেনে নিল। তারপর একখানা পাঁচটাকার নোট বকশিস করে ওকে বিদায় দিল। রাম হেসে কেঁদে পায়ের ধুলো নিয়ে অদৃশ্য হল।

শুভকে দেখেই সাহা অভ্যর্থনা জানালেন, আরে আসুন স্যার, এত ঘন ঘন পায়ের ধুলো—কী সৌভাগ্য আমার।

নিজের পকেট থেকে সিগারেট অফার করতে করতে শুভ প্রশ্ন করল, তারপর?

কেস কদ্দূর গড়াল? আর কিছু ক্লু টু পাওয়া গেল?

ওটা তো ফিক্স আপ হয়েই আছে। এখন শুধু কাগজপত্র তৈরি করা। ক্রিমিন্যালকে তো চালান দিয়েই দিয়েছি।

অ্যাঁ! বলেন কি? হরিপদকে?

তাছাড়া আর ক'টা হত্যাকারী আছে আমাদের হাতে?

আর ইউ সিওর, হরিপদই এ কাজ করেছে?

কোন ভুল নেই।

স্টেটমেণ্ট দিয়েছে?  স্বীকার করেছে কিছু?

খাঁটি বাস্তু ঘুঘু। এক অক্ষরও ওকে দিয়ে কবুল করানো যায়নি। দারুণ সামলে নিয়েছে ছোকরা। ওর এখন এক কথা, আমি নির্দোষ। আমার যা কিছু বলবার ল-ইয়ার মারফৎ আদালতে বলব। অথচ প্রথম যখন ধরা পড়ল তখন নার্ভাস হয়ে উল্টো পাল্টা কথা কয়েছে। হল কি বলুন তো? নিশ্চয় পিছনে লোক আছে, মদত যোগাচ্ছে, তাই না? সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন।

অসম্ভব নয়।

তাতে আমার কাঁচকলাটি এসে যায়। আমার হাতে যা প্রমাণ আছে ওকে ফাঁসীকাঠে লটকানো কিছু কঠিন কাজ হবে না আমার পক্ষে।

কিন্তু যদি উল্টো ঘটনা ঘটে যায়? শুভ সিগারেটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে হাসল, যদি দেখা যায় হত্যাকারী সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি। হত্যার সঙ্গে হরিপদর কোনই যোগ নেই?

আপনিও শেষে উল্টো গীত গাইতে শুরু করলেন?

ইয়েস। ইউ উইল হ্যাভ টু ফেস দি মিউজিক। শুভঙ্কর হাসল, কিছু উল্টো প্রমাণ না পেলে কি আর আমি এসব কথা বলছি। বাই দি বাই, আমি আপনার কাছে অন্য প্রয়োজনে এসেছিলাম।

অ্যাট্ ইয়োর সার্ভিস। বলুন—

মৃতের কাছে যে জিনিষগুলো পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো আর একবার দেখব।

আপনাকে দেখাতে কোনই অসুবিধে নেই। বক্স করেই রেখেছি, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল, কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো?

কিছু না, সামান্য একটু খটকা। অর্ধদগ্ধ সিগারেটটাকে ছাইদানির মধ্যে টিপে নেভাতে নেভাতে বলল শুভ, আমাকে শ্রীমন্তবাবুর লেখা সেই ছোট্ট চিঠিটা আর জখম হাতঘড়িটা দেখালেই চলবে। আর হ্যাঁ, প্রসূনবাবুর কোটের পকেটে পাওয়া সিগারেটের প্যাকেটটাও বের করবেন।

অন্যমনস্ক শুভঙ্কর লম্বা লম্বা পা ফেলে তপতীদের বাড়ির দিকেই এগোচ্ছিল, এমন সময় শ্রীমন্তই প্রথম ওকে দেখতে পেয়ে পাবলিক বাসের জানলা থেকে ডাকল, আরে শুভঙ্করবাবু যে? দাঁড়ান আসছি—

মাঝপথেই বাসটাকে কোনক্রমে দাঁড় করিয়ে শ্রীমন্ত নেমে এল। উল্টোদিকে যাচ্ছিল সে। বলল, আরে মশাই তুদিন যে আর দেখাই নেই! কী ব্যাপার?

সময় পাচ্ছি না, খুব ব্যস্ত। হাসল শুভঙ্কর, তাছাড়া আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?

কেন, কেন? ঈষৎ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল শ্রীমন্ত।

এই সপ্তাহের শেষেই শিলিগুড়ি চলে যাচ্ছি। অর্ডার এসে গেছে।

দাঁতে জিভ ঠেকিয়ে তুঃখজনক শব্দ করে বলল শ্রীমন্ত, ইস্, বলেন কি?

হ্যাঁ। শুভঙ্কর বলল, যেতে যখন হবেই—

এদিকে শুনেছেন তো? ভাগিনেয় চন্দরই নাটের গোড়া। পুলিশ কেঁচো খুড়তে সাপ বের করে ফেলেছে। গল্পের বইতে পুলিশকে যতখা।ন ফুলিশ করে আঁকা হয় বাস্তবে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। কি বলেন? তাছাড়া—পকেটে থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, নিন, একটা বিদেশী সিগারেট খান। যা বলছিলাম, এই মিঃ সাহা লোকটি খুব করিৎকর্মা। ইতিমধ্যেই ক্রিমিন্যালটাকে জেলহাজতে চালান করে দিয়েছেন, কেসও তৈরি ফেলেছেন।

সিগারেটটা ধরিয়ে নিতে নিতে শুভ বলল, হ্যাঁ মশাই, প্রসূনবাবুর ঘড়ি খোয়া গিয়েছিল আমাকে তো কই বলেননি!

আপনি কি করে জানলেন? অবাক হয়ে তাকাল শ্রীমন্ত, বলিনি তার কারণ, ঘড়ি সত্যি সত্যি চুরি যায়নি, পাওয়া গিয়েছিল। আর সেই ঘড়িটাই মৃত্যুর সময় প্রসূনের হাতে বাঁধা ছিল, দেখেননি?

তা বটে! শুভর যেন মনে পড়ল দৃশ্যটা, রামচন্দ্র তাহলে নিয়ে ভাগেনি?

আরে না না, ঘড়ি ও নেয়নি। বাথরুমের তাক থেকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু টাকা সুদ্ধ ডায়েরীটা রামই বগলদাবা করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

আরও একটা কথা আপনি আমাকে বলেননি কিন্তু!

কি কথা?

প্রসূনবাবুর হবি ছিল সাদা ইঁদুর পোষা, কই একথা তো বলেননি কখনো।

সাদা ইঁদুর তো পুষেছিলাম আমি, প্রসূন বরং দু'চক্ষে দেখতে পারত না। একদিন ওর কোটের পকেটে ঢুকে বসেছিল ইঁদুরটা। কারখানায় পৌঁছবার আগে টেরই পায়নি ও। সাদা ইঁদুরের ওপর ভীষণ রাগ ছিল ওর। আমিও তাই ইঁদুরটাকে বিদেয় করে দিয়েছি। কিন্তু, জানলেন কার কাছে?

বৈঠকখানায় বসে তপতী ওর এক বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছিল, শুভকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, একটা দারুণ সুখবর আছে।

শুভ মুচকি হেসে বলল, কার? তোমার না আমার?

ঠাট্টা নয় শুভদা, শুনলে তোমার পিলে চমকে যাবে!

যাক, তবু বলেই ফেল।

শ্রীমন্তবাবু রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেলেন।

বল কি? এই একটু আগেই তো ওঁর সঙ্গে দেখা, কই কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হল না। রোল্‌স কিংবা ক্যাডিল্যাক নয়, স্রেফ স্টেট ট্রান্সপোর্টের একখানা ঝরঝরে বাসে চেপেই যাচ্ছিলেন।

এর পর থেকে আর যাবেন না। এই ছ্যাখ—বান্ধবীর হাত থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে একটা পৃষ্ঠা খুলে দেখাল। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর সাম্প্রতিক খেলায় প্রথম পুরস্কার বিজয়ীর নাম ছাপা

হয়েছে ঠিকানা সহ। শ্রীমন্ত ঘোষ একেবারে দেড় লাখ টাকা পেয়ে গেছেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্য শুভঙ্কর যেন বোবা হয়ে গেল, নিজের চোখকে সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তপতীর বান্ধবী চোখে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ ছুঁড়ে, 'আচ্ছা চলি তোরা গল্প কর' বলে চলে গেল—তাও শুভঙ্কর বুঝি খেয়াল করল না।

কি গো, আছ না গেছ? মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল তপতী।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে শুভঙ্কর বলল, না হাসি না।

তবে কি কান্না?

আহ্! আমি অন্য কথা ভাবছি।

ন্যাকামি ভরা গলায় তপতী সুর করে বলল, সেটা এমন কি কথা শুভদা?

যাবার আগে আমার ফেয়ারওয়েলটা ভালই হবে। শুভঙ্করের গলাটা বাষ্পাচ্ছন্ন শোনাল, শুধুই খাওয়াচ্ছ না সঙ্গে উপহার-টুপহারও দেবে?

তপতী হঠাৎ থমকে গেল। তার চটুলতা আর চোখের হাসি নিমেষে ভ্যানিশ।

কেমন ব্যথিত চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

শিলিগুড়ি আমার পোস্টিং হয়েছে। পরশু পর্যন্ত বোধহয় এখানে আছি। তোমাদের বিয়েটা বোধহয় আমি—

শুভদা! তপতী হঠাৎ এমন তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে উঠবে শুভ বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি। ওর চিৎকার শুনে ভেতর থেকে ছোট বোন ছুটে এসেছিল তারপর শুভকে দেখেই জিভ কেটে পালাল।

গলা নামিয়ে তপতী এতক্ষণে ফের কথা বলল, তোমার মত নির্বোধ এবং নিষ্ঠুর আমি দুজন দেখিনি। তুমি বোধহয় অন্ধও! কিছুই দেখতে পাও না!

কেন, কি হয়েছে? তুমি কি বলতে চাও সত্যিই আমি—

বুঝবে না, আর বুঝেও কাজ নেই। শুধু দয়া করে যার তার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে কিছু বল না। দোহাই তোমার শুভদা, আমাকে একটু অন্তত অনুগ্রহ কর। তপতীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জলের ধারা নেমে এল।

শুভর কপালে রেখাগুলো গভীর হল, সে নিষ্পলক চোখে তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। নারীচরিত্র তার কাছে এখনো দুর্বোধ্য। ক্রিমিন্যাল হাঁ করলেও তার পেটের কথা টের পেতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু একটা মেয়ে যখন কথা বলে তখনই বোধ করি সে সবচেয়ে রহস্যময় হয়ে ওঠে। তপতী যে প্রসূনের বাকদত্তা ছিল এই কথাটা এত দিনে স্পষ্ট করে বুঝতে পারল।

শুভ দুঃখিত হল। বলল, আই অ্যাম স্যরি! ভেরী ভেরী স্যরি, তপতী আমাকে ক্ষমা করিস। তুই যে প্রসূনকেই—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

আঁচলে চোখ মুছে নিয়েছিল তপতী, কিন্তু তার ডাগর চোখ দুটোর মণি তখনও করমচার মত লাল হয়ে আছে। ক্ষ্যাপা গলায় তপতী বলল, তুমি ছাই বুঝেছ। তুমি ছাই ডিটেকটিভ! দুমদুম করে পা ফেলে সে ভেতরে চলে গেল, শুভর ডাকে সাড়া দিল না, ফিরেও তাকাল না।

শুভর ভেতরটা তখন যন্ত্রণায় মুচড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবার জন্যে যেই পা বাড়িয়েছে অমনি কে ডাকল। ফিরে তাকিয়ে দেখল তপতীর বোন ললিতা।

যাবেন না, বসুন। দিদি চা নিয়ে আসছে। যাবেন না কিন্তু—ছটফটে কিশোরী দ্রুত পায়ে আবার ভেতরে চলে গেল।

তপতী চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই শুভঙ্কর হাতের খবরের কাগজখানা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, দেখেছ, দুর্গাপুরের খবর বেরিয়েছে আজ?

নতুন সংসার সাজাতে গোছাতেই তপতীর দিন কেটে যায়,

কাগজের হেড লাইনগুলোতে চোখ বুলোনোই হয়ে ওঠে না সব দিন। রান্নাবান্না সেরে যেটুকু সময় পায় শুধু জানলা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে থাকে আর শুভঙ্করকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বোনে। শিলিগুড়ির এই কোয়ার্টারটা ভারী সুন্দর। ঘরে বসেই হিমালয় দেখা যায় দিনটা পরিষ্কার থাকলে।

ব্যগ্র হয়ে কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ল তপতী, কই, কি লিখেছে?

শ্রীমন্ত ঘোষের যাবজ্জীবন সাজা হয়ে গেছে কাল, সেই কথাই লিখেছে।· শুভঙ্কর চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, দেখতে দেখতে ক'টা মাস কেটে গেছে, কত ঘটনা ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। তারপর তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল, তোমার লাইফ সেণ্টেন্সও বোধ-হয় দু'মাস পূর্ণ হতে চলল।

তপতী হাসল না। খবরটা পড়া হয়ে গেলে কেমন উদাস চোখে তাকিয়ে থাকল কিছু সময়। পরে বলল, উঃ ভাবাও যায় না, একটা জলজ্যান্ত খুনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার।

এবং ঘনিষ্ঠতা—

এই, বাজে কথা বল না!

আমাকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলে ওই কোল্ড ব্লাডেড ক্রিমিন্যালের ডেরায়।

ভালই করেছিলাম। তোমাকে না নিয়ে গেলে ওই খুনের কিনারা হত না। মাঝ থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ওই হরিপদর জীবন বরবাদ হয়ে যেত। সত্যি, কি করে যে তুমি ওই রহস্য খুঁড়ে বের করলে আশ্চর্য! ওগো, বল না শুনি?

বলে দিলে আর কিছুই আশ্চর্য লাগবে না। মনে হবে খুবই সামান্য ব্যাপার।

তা হোক তুমি বল। তপতী আদুরে গলায় বলে, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

তুমি চা খাও। আমি বলছি। শ্রীমন্ত কি ভাবে তার বাল্যবন্ধু প্রসূনকে খুন করেছিল এবং নিজের অ্যালিবি সাজিয়েছিল সেই

কথাই বলব। খাপ থেকে চুরুট বের করে একটা ধরিয়ে নিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আগে মোটিভ অর্থাৎ খুনের উদ্দেশ্যটা বলতে হয়। কি কারণে আবাল্যের বন্ধুকে সে খুন করতে গেল। ছোটবেলা থেকেই প্রসূন লেখাপড়ায় শ্রীমন্তর চেয়ে অনেক ভাল ছিল, মনটাও ছিল খোলামেলা। পড়াশোনা এবং চাকরির জীবনে বন্ধুকে সে বরাবর সাহায্য করেই এসেছে। শ্রীমন্ত প্রতি পদেই প্রসূনের কাছে ছোট হয়ে গেছে, তার ফলে মনের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষ ছিল। পরে সেইটে দানা বাঁধে তোমাকে কেন্দ্র করে। শ্রীমন্তর ধারণা হয়েছিল প্রসূনই ধীরে ধীরে তোমার মন অধিকার করে নিচ্ছে। তাছাড়া তোমাকে পাওয়ার পক্ষে—আহা উত্তেজিত হয়ো না, কেউ যদি তোমাকে পেতে চায় তুমি কি করবে, শ্রীমন্তর আর একটা বড় বাধা ছিল, একটা বড় বাধা ছিল, একটি মেয়েকে সে গোপনে বিয়ে করে পালিয়ে এসেছিল। দক্ষিণেশ্বরে মেয়েটির বাড়ি, এক সরকারী অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে, অ্যামেচার স্টেজের অভিনেত্রী। বাপ ক্যান্সারে ভুগছে, অনেক কষ্টে নিজের রোজগারে সংসার চালায়। এই মেয়েটিই প্রসূনের কাছে কখনো-সখনো আসত, এসে কান্নাকাটি করত। এর কথাই প্রসূন তোমাকে পরে বলবে বলেছিল।

শ্রীমন্তকে প্রসূন এই ব্যাপারে চাপ দিচ্ছিল, ফলে প্রসূনকে সহ্য করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছিল শ্রীমন্তর পক্ষে। তা সত্ত্বেও শ্রীমন্তকে খুন করত কিনা সন্দেহ যদি না এই সময় একটা বিরাট অঙ্কের টাকা তার নাগালের মধ্যে এসে দাঁড়াত। প্রসূন নিয়মিত লটারীর টিকিট কিনত তুমি জানো, কিন্তু সেটা ঠিক টাকার লোভে নয়। তাই অনেক সময় লটারীর খেলা হয়ে যেত প্রসূনের হুঁশ থাকত না। কিন্তু টিকিটগুলি সে জমা করে রাখত ডায়েরীর ফোল্ডের মধ্যে। তুমি আর আমি প্রথম যেদিন ওদের বাংলোয় বেড়াতে যাই সেদিনই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে খেলাটি হয় তাতে প্রসূনের টিকিট প্রথম পুরস্কার বিজয়ী হয়। পরদিনের কাগজে ফলাফলটা বেরোনোর

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্তর চোখে পড়ে যায়। ব্যস্, মোটিভ কমপ্লিট—প্রসূনকে সরিয়ে দিয়ে ওই দেড় লাখ টাকা হস্তগত করে, সেই টাকার কিছুটা অংশ ব্যয় করে দক্ষিণেশ্বরের মেয়েটির একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করে তোমাকে বিয়ে করবে—ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা এই রকমই ছিল শ্রীমন্তর। আগের সন্ধ্যায় তুমি ওদের নিমন্ত্রণ করে আসায় এবং আমি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আসব কথা থাকায় একটা সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল শ্রীমন্তর। প্রসূনের মতই শ্রীমন্ত প্রচুর ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ত, এসব ব্যাপারে মাথা ছিল খুব সাফ। অলস সময়ে ও বেশ কিছুদিন আগে থেকেই নিশ্চয় বন্ধুকে বিনা ঝুঁকিতে সরিয়ে দেবার প্লট ভাঁজছিল। এবার সেটাকে কাজে পরিণত করার সুযোগ এসে গেল। প্রায় বিদ্যুৎ গতিতে অ্যাকশানে নেমে পড়ল। প্রথমেই ডায়েরীটা সরিয়ে ফেলল, শুধু টিকেটটা সরালে পাছে প্রসূনের মনে সন্দেহ জাগে তাই টাকা শুদ্ধু ডায়েরীটা সরিয়ে সন্দেহটা চাকরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। প্রসূনের হাতঘড়িটাও সেই সঙ্গে, তবে অন্য উদ্দেশ্য। দম না পেয়ে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেলে কাঁটা ঘুরিয়ে প্রসূন সেটার তারিখ আর সময় নির্দিষ্ট করে রাখল। তারিখটা তোমাদের সেই টিপার্টির দিনের এবং সময়টা ঠিক নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট পরে অর্থাৎ ছটা বেজে পঁয়ত্রিশ করে ঘড়ির ডায়ালটা চুরমার করে রাখল। যাতে মনে হয় হত্যাকারীর আঘাতেই ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। তার অ্যালিবির জন্যে এটা খুব দরকারী প্রমাণ। তারপর চাকরকে তাড়ানো, নির্দিষ্ট দিনে স্টেশনে গিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম টিকিট, মাথার কাঁটা আর ফুল সংগ্রহ করে আনা এবং আগে থেকেই প্যাডের কাগজে একটি চিঠি লিখে রাখা, যে চিঠির বয়ানটাই আমার সামনে বসে মুখস্থ লিখেছিল শ্রীমন্ত, আমাকে পড়িয়ে অ্যাশট্রে চাপা দিয়ে রেখে ঘর তালাবন্ধ করে অ্যাশট্রে চাপা চিঠিটা নিজের পকেটে পুরে বেরিয়ে এসেছিল সে। বেরিয়ে আসার আগে বৈঠকখানা ঘরের আলো নিভিয়ে সুইচের ডগায়, এক টুকরো রুটি বাঁধা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে এল। দড়িটা তৈরি করাই ছিল, ইন ফ্যাক্ট, বেশ কয়েকদিন

ধরে রিহার্শাল দেওয়া চলছিল এইভাবে রুটির টুকরো ঝুলিয়ে। এক-প্রান্তে প্রায় কেজি খানেক ওজনের বাটখারার মত একটা লোহার চাকা দড়ির অন্যপ্রান্তে একটা ফাঁস, ফাঁসটা সুইচের ডগায় পরিয়ে হাত তিনেক লম্বা দড়িটা ঝুলিয়ে দেয়। লোহার খণ্ডটার কাছেই রুটির টুকরোটা বাঁধা থাকে। পোষা ইঁদুরটা যেই এসে রুটির টুকরো ধরে টান দেবে অমনি সেই সামান্য টানেই সুইচ অন হয়ে যায়, আলো জ্বলে ওঠে। লোহার ভারটা ওই জন্যেই দেওয়া, যাতে ছোট একটা ইঁদুরের পক্ষেও সুইচ অন করে দিতে অসুবিধে না হয়। তপতী কিছু বলতে চায় বুঝতে পেরে শুভ থামল।

কিন্তু প্রসূনও যে সেদিন স্টেশনে গিয়েছিল—

ওটা স্রেফ বানানো গল্প। প্রসূন আদৌ বেরোয়নি, বরং সকাল সকাল শ্রীমন্তই স্টেশনের কাজটা সেরে এসেছিল। তারপর বিকেলে চা খাওয়ার পর প্রসূন তার প্যাকেট থেকে শ্রীমন্তকে একটা সিগারেট দিয়ে, নিজেরটা ধরিয়ে যেই তৈরি হবার জন্যে নিজের ঘরে চলে গিয়েছে, শ্রীমন্তও পিছন পিছন এসে মোটর সাইকেলের রেঞ্চটা দিয়ে ওর ঘাড়ে আঘাত করে। আঘাতটা মারাত্মক এবং মোক্ষম জায়গায় হওয়ায় প্রসূনের মৃত্যু ঘটে সঙ্গে সঙ্গে। প্রসূন মারা গেছে নিশ্চিন্ত হবার পর শ্রীমন্ত প্রসূনের কোটের পকেটে সিগারেটের প্যাকেট আর আগে থেকে লিখে রাখা চিঠিটা ড্যালা পাকিয়ে ভরে দেয়। ঘরের চাবি আর মানি ব্যাগটা পকেটে গুঁজে দেয়। খাটের তলায় ফেলে রাখে মাথার কাঁটা আর ফুলটা। যেন প্রসূন বাইরে থেকে ফিরে বাইরের ঘরের সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে শ্রীমন্তর লেখা চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়ার পর বাজে কাগজের মত ড্যালা পাকিয়ে পকেটে ফেলে নিজের ঘরে যায়। সেখানে গিয়ে যেই কোট খুলেছে অমনি কেউ তার ঘাড়ে আঘাত করে, এমন একটা ধারণা স্বভাবতই তৈরি হল। এর পরের কাজ সামান্য। আমার আসার অপেক্ষায় পোশাক পরে নিয়ে অপেক্ষা করা।

কী সাংঘাতিক! কিন্তু তুমি কি করে ওকে সন্দেহ করলে?

কতকগুলো সামান্য অসঙ্গতি আমার প্রথমেই চোখে পড়েছিল কিন্তু তখন কিছু মনে হয়নি। যেমন অ্যাশট্রের ওপর ইঞ্চিটাকের ছাই জমে নিভে থাকা সিগারেট। কাগজ পড়তে পড়তে কোন মানুষ সিগারেট নামিয়ে রেখে সেটার কথা ভুলে যায় না। বিশেষ করে সেদিনের কাগজে কোনই ইণ্টারেস্টিং খবর ছিল না। বন্ধুকে ছোট্ট একটা নোট লিখে কেউ অন্যকে পড়িয়ে মতামত চায় না। টেবিলে চিঠি পেয়ে আবার সেটা প্রসূনের পক্ষে পকেটে রাখার কি প্রয়োজন। রাখলেও ড্যালা পাকাতে যাবে কেন? যে সিগারেটটা তার গায়ের তলায় চাপা পড়ে নিভে গিয়েছিল, সাইজ দেখে বোঝা যায় সেটা সদ্য ধরানো হয়েছিল, বোধহয় দুটো টানও দেওয়া হয়নি। যদি কোন মেয়ে সে সময় তার সঙ্গে ছিল এবং কোটটা খুলে রেখে প্রসূন তার আলিঙ্গন-বদ্ধ হয়েছিল মনে করা যায় এবং এই জাতীয় কোন আচরণের সময়েই মেয়েটার মাথা থেকে কাঁটা এবং ফুলটা মেঝেয় ছিটকে পড়েছিল এমন হয়, তা হলেও পিছন থেকে আঘাত করার সময় ঘড়ির ডায়ালে কি করে চোট লাগবে? প্ল্যাটফর্ম টিকেট ফটকে জমা নেয়নি এটাও অস্বাভাবিকই লেগেছিল আমার। বিশেষ করে মৃতের জিনিস-পত্রের মধ্যে একটা জিনিসের অভাব আমার ভীষণ খটকা লাগিয়ে-ছিল। কি সেটা অনুমান করতে পারো?

কলম। যে লোকটা এত কলম ভালবাসে সে বাইরে গিয়েছিল পকেটে কলম না নিয়ে, এটা কি রকম ব্যাপার? তার পরদিন কাগজটা খুলে দেখতে গিয়ে কাগজের ভাঁজের মধ্যে যেভাবে একখানা হ্যাণ্ডবিল দেখতে পাই তা-ই আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। কাগজটা যে আদৌ খোলাই হয়নি, আমিই প্রথম সেখানা খুললাম তাতে আর সন্দেহই থাকল না। আর একটা ভুল করেছিল শ্রীমন্ত, আর সেটাও আমার চোখ এড়িয়ে যায়নি। শ্রীমন্তর একটি বিশেষ কলম দিয়েই দু'দিনের দুটো চিঠি লিখেছিল। প্রথম চিঠিটা, যেটা মৃতের পকেটে ভরে দেওয়া হয়েছিল সেটার কালি ছিল নীল, আর আমার সামনে যে চিঠিটা লিখেছিল সেটা কালো কালিতে। ঘড়ির কথায়

আবার আসি—ডেট পাল্টাতে গিয়েও একটা বড় রকমের ভুল করেছিল সে, যদিও সেটা কারো চোখে পড়ার কথা নয়। রাত বারোটার পরেই ঘড়ির তারিখ বদলে যায়। যে ছটা পঁয়ত্রিশ সে ঘড়িতে দাঁড় করিয়েছিল সেটা বিকেল ছটা নয়, সকাল ছটা পঁয়ত্রিশ। বারোটার পর কাঁটা ঘুরিয়ে যেই ছটা পঁয়ত্রিশ হয়েছে অমনি থেমে গিয়েছে। আরও বারো ঘণ্টা কাঁটা ঘোরালে প্রমাণটা নির্ভুল হত আর কি!

কী আশ্চর্য, তোমার চোখে এতও পড়ে! তপতী চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, শুধু আমাকে ছাড়া! কাছের মানুষটাকেই তুমি দেখতে পাও না। উল্টে ভুল বুঝে কত অভিমান!

শুভ হাসল, প্রেম যে জন্মান্ধ!

হ্যাঁ, কত যে প্রেম আমার জানা আছে মশাই! তপতী নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে সোফার হাতলে বসে শুভঙ্করের গালে ছোট করে একটা চুমু দিল। তারপর হেসে ফেলে বলল, থাক, ওসব খুন জখমের কথা আর বল না।

# এক চুলের জন্য

একটা টিপটপ সাজানো ঘর হঠাৎ ছত্রাখান হয়ে গেলে এরকমই দেখায়। ক্যারম বোর্ডের ওপর প্রথম স্ট্রাইকার খাওয়া ঘুঁটিগুলোর ভাঙা ব্যূহ যেন অসংলগ্ন হয়ে আছে। ডিভানটা নিজের জায়গা থেকে সরে গেছে একদিকে। সেন্টার টেবিলটা ধাক্কা খেয়ে কোণাকুণি ঘুরে গেছে, সোফা-সেটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে দাঁড়িয়ে নেই। খানদুই বই আর একগোছা পত্রিকা তার ওপর তাসের মত ছটকে গেছে। কাট গ্লাসের জলের গ্লাসটা উল্টে পড়েছে, নিচে গালচের ওপর পোর্সি-লিনের ভারী অ্যাশট্রেটা উপুড় হয়ে আছে।

জানলাগুলোর পেলমেট থেকে পুরু পর্দা টানটান ঝুলে আছে। ঘর আবছা অন্ধকার। বোবা ঘরের মধ্যে একমাত্র সজীব বস্তু সিলিং

ফ্যানটি বনবন করে ঘুরছে। তেমন করে কান পাতলে বোধ হয় খুব মিহি চিকচিক একটা শব্দ কানে আসতেও পারে। সেটা একটা সোনালী লেডিজ হাতঘড়ির, প্রথম দর্শনে চোখে পড়ে না।

কুঁচকে যাওয়া কার্পেটের ওপরে যে গৌরবর্ণ শরীরটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে, সে যুবতী এবং সুন্দরী এবং বিধ্বস্ত। দেহে বিন্দুমাত্র আবরণ নেই, তাই হাতের ঘড়িটা বড় বেমানান ঠেকে। তার নীলচে বিবর্ণ ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফোলা, ফাঁক হয়ে আছে। কষে রক্ত। জমাট বেঁধে আছে। চোখ দুটো বোজা।

মুরগীর ছেঁড়া পাখনার মত তার ব্লাউজ আর ব্রা একপাশে জড়া-মড়ি করে পড়ে আছে। দেওয়ালের গায়ে শাড়ি আর পেটিকোট কেউ তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। এখানে কিছু আগে যে কী কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, এক পলক দেখেই তা বলে দেওয়া যায়। এ ধরনের ঘটনা তো হাল ফ্যাশানের ফ্ল্যাটগুলোয় আকচার ঘটছে, তার কিছু কিছু কাগজে বেরোয়, বাকি চাপা পড়ে যায়। পুলিশ কয়েক ফার্লং এগিয়ে ফাইল গুটিয়ে নেয়। অপরাধী ধরা পড়ে না, অপরাধের কার্যকারণ অবশ্য অজানা থাকে না।

গণপতি হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল। তার চোখে জল। সে ঘরের মধ্যে পুরো ঢুকল না, দরজার ফ্রেমের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল। মিঃ করচৌধুরী ওর কাঁধে হাত রেখে মৃদু একটু চাপ দিলেন, তারপর বললেন, 'আপনি পাশের ঘরে বসুন, দরকার হলে ডাকব।'

গণপতি ভেতরে ভেতরে কেমন একটু স্বস্তি পেল, সত্যিই এই দৃশ্যের মানসিক চাপ সে আর সহ্য করতে পারছিল না। তবে পাশের ঘরে সে গেল না। এই ঘরের সামনেই ডাইনিং স্পেস। সেখানে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

বেতের মত ছিপছিপে, স্মার্ট চেহারা। মাথার ঘন চুল ছোট করে ছাঁটা। বয়স ধরা যায় না। পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টি অনায়াসে হতে পারে। দুদিকেই রগের পাশে সামান্য সাদা।

করচৌধুরী ঘরে ঢুকে দু'হাঁটুর ওপর হাত রেখে উবু হয়ে দাঁড়ালেন। সন্ধানী চোখে ঘরের চারপাশটা একবার জরিপ করে নিয়ে মৃতের পাশে গিয়ে বসলেন। একটা হাত তুলে নিয়ে কী দেখলেন, তারপর হাতখানাকে কনুইয়ের কাছে একবার মুড়ে আবার খুলে দেহের পাশে নামিয়ে রাখলেন। চোখের পাতা টেনে মণি দেখলেন, তারপর পকেট থেকে আতস কাঁচ বের করে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। ঠোঁটদুটো কাঁচের তলায় পুরুষ্ট কমলা লেবুর কোয়ার মত বৃহৎ এবং রেখাময় দেখালো। গলার কাছটা ভাল করে পরীক্ষা করে বুকের দিকে তাকালেন। উদ্ধত স্তনযুগলে আঁচড়ের চিহ্ন রয়েছে গোটাকত। ওপাশের বাহুমূলে ঈষৎ গভীর ক্ষতরেখা। ওঁর মনে হল, ঘড়ির স্টিলের ব্যাণ্ডের কোণায় খোঁচা লেগে ব্যাপারটা ঘটেছে। চোখ পড়ল পাথর বসানো কাঁকন পরা মণিবন্ধের দিকে। দৃষ্টি একপলক স্থির হয়ে রইল সেদিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে কি একটা সূক্ষ্ম জিনিস খুলে নিলেন। একটা সাদা খাম বের করে তার মধ্যে জিনিসটা ভরে নিতে নিতে হঠাৎ সেণ্টার টেবিলের তলায় চোখ পড়ল, একটা বাসের টিকিট ভাঁজ করা অবস্থায় পড়ে আছে। হাতঘড়ির ব্যাণ্ডের তলায় গুঁজে রাখবার জন্যে লোকে যেভাবে ভাঁজ করে। কৌতূহলবশত কুড়িয়ে নিলেন টিকিটটা তারপর সাবধানে হাতের ছাপ বাঁচিয়ে উল্টে পড়ে থাকা অ্যাসট্রেটা সোজা করলেন। পরিষ্কার অ্যাসট্রে, ছাইটুকু আগেই পড়ে গেছে। শুধু একটা সিগারেটের ফিলটারটিপসহ সিকিটাক অংশ আর দুটো পোড়া কাঠি। একটা কাঠির বারুদটুকু মাত্র পুড়েছে, অন্যটার কাঠির কিছু অংশ। কার্পেটের ওপর সামান্য তফাতে আর একটা আধলা হয়ে ভেঙে যাওয়া কাঠির মাথার অংশটা পড়ে ছিল। করচৌধুরী প্রয়োজন বোধে ওগুলো কুড়িয়ে আর একটা খামের মধ্যে ঢোকালেন। সোফার তাকিয়াগুলো একবার উল্টেপাল্টে পরখ করে দেখলেন।

ঘরের বাইরে দুজন লোক অপেক্ষা করছিল। একজন ফটোগ্রাফার, অন্যজন ফরেনসিকের লোক। উনি তাঁদের ইশারায় ঘরের মধ্যে

ঢুকতে বলে বেরিয়ে এলেন। ওঁকে বেরিয়ে আসতে দেখে গণপতি উঠে দাঁড়াল। এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তার মুখচোখ কেমন বসে গেছে। বোধ হয় এই মুহূর্তে সে পৃথিবীর সবচেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট, অসহায় আর দুঃখী মানুষ। মর্মান্তিক ভাবে আহত, অপমানিত। তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে কেউ বা কারা কেবল নির্মমভাবে হত্যা করেই রেখে যায় নি, চরম অপমান করে, বেইজ্জত করে রেখে গেছে।

'কী বুঝলেন ?'

'ডাক্তারের রিপোর্টের সঙ্গে আমি একমত। শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়েছে, এবং এই ব্যাপারে সোফার একটা তাকিয়াকে কাজে লাগানো হয়েছিল।' করচৌধুরী পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে খুললেন, তারপর গণপতির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'নিন। এখন মনকে শক্ত করতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।'

'থ্যাঙ্কস !' বলে গণপতি মাথা নাড়ল, 'আমি সিগারেট খাই না।'

করচৌধুরী কোন মন্তব্য না করে নিজের সিগারেটটি ধরিয়ে নিলেন তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন শত্রু ছিল ?'

'জানা নেই। কি কারণেই বা থাকবে ?'

'পুরুষ বন্ধু ? তেমন মেলামেশা করতেন কারও সঙ্গে ?'

'বিয়ের আগের কথা নিশ্চিত করে বলতে পারব না, তবে এখানে কেউ ছিল না। মেয়েদের সঙ্গেই যা ওঁর মেলামেশা ছিল, কিন্তু যাকে বন্ধুত্ব বলে সেরকম গভীরতা কারো সঙ্গেই গড়ে ওঠে নি।'

'আচ্ছা, আপনাদের দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল ?'

'আমরা খুব সুখী ছিলাম।'

'দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। আপনাদের দাম্পত্য জীবন দেখে কারও পক্ষে জেলাস হওয়া কি অসম্ভব ?'

গণপতি কি ভাবল, 'কি জানি ! তবে সেরকম কাউকে তো ভাবতে পারছি না। আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা সামান্য। তাদের সঙ্গেও যা কিছু দেখা-সাক্ষাৎ ওই ক্লাবে, তাস কিংবা দাবার আড্ডায়। একমাত্র সমীর আর শেখর মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া

করে, আমিও যাই। তবে মিনতি একবারের বেশি বোধ হয় কারও বাড়িতেই যায় নি।'

মিঃ করচৌধুরী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কিন্তু খুনী যে আপনার স্ত্রীর অপরিচিত কেউ নয়, সে প্রমাণ আমি পেয়েছি। আপনি ভাল করে ভেবে দেখার চেষ্টা করুন, এই ধরনের বর্বর কাজ আপনার পরিচিত কারও পক্ষে করা সম্ভব কিনা।'

ঘটনাটা এই, সেদিন রবিবার। রবিবারেও গণপতির অফিস থাকে। সে একটা খবরের কাগজে কাজ করে। তার 'অফ ডে' বেস্পতিবার। সে যথারীতি অফিসে গিয়েছিল। ঠিক ছিল, মিনতি পৌনে তিনটে নাগাদ লাইটহাউসের তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। গণপতির অফিস ওই পাড়াতেই। সেও অফিস থেকে তাড়াতাড়ি কেটে সিনেমা হলে চলে আসবে। তুজনে একসঙ্গে সিনেমা দেখবে। টিকিট আগে থেকেই কাটা ছিল। একখানা টিকিট তবু সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল গণপতি। যদি কোন কারণে অফিস থেকে বেরোতে দেরি হয়ে যায়, তাহলে মিনতির দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার নেই, ভেতরে গিয়ে বসতে পারবে।

তবে দেরি হয় নি গণপতির, বরং তিনটে বাজার কুড়ি মিনিট আগেই সে লাইটহাউসে পৌঁছে গিয়েছিল। আর সচরাচর যে বিফোর টাইমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেখে থাকে দেরি হচ্ছিল সেই মিনতিরই। তিনটে দশ পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে গণপতি হলের মধ্যে গিয়ে বসল। প্রতি মুহূর্তেই সে আশা করছিল, তার পাশের খালি সীটটার অধিকারিণী এসে যাবে। দেরিতে কেউ হলে ঢুকলেই সে চমকে প্রবেশ পথের দিকে তাকাচ্ছিল, কিন্তু না, মিনতি এল না। ফসফরাস মাখা ঘড়ির ডায়ালে সময় তখন তিনটে পঁয়ত্রিশ। আর বসে থাকা যায় না এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে। ছবিতে মনও বসাতে পারছিল না সে। কলকাতার পথঘাট আসলে তুর্ঘটনার রাজপথ। যে কোন সময়ে সেখানে অ্যাকসিডেন্ট ঘটে যেতে পারে, ঘটে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। গণপতির মধ্যে অস্থিরতা আর

আশঙ্কা কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। হল থেকে বেরিয়ে এসে গণপতি বাড়িতে ফোন করল। রিং হয়েই চলল, কেউ ফোন ধরল না। তার মানে মিনতি বাড়ি থেকে যথারীতি বেরিয়েই পড়েছে। কিন্তু যদি এমন হয়, মিনতি ঘুমিয়ে পড়েছে ? আর যা ঘুম মিনতির, টাইমপিসের অ্যালার্ম কানের কাছে বেজে গেছে কতদিন, তবু তার বেহুঁস ঘুম ভাঙে নি। কথাটা মনে হতেই মুখোমুখি ফ্ল্যাটের ভদ্রলোককে টেলিফোন করল গণপতি। ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছেন, ওঁর স্ত্রী ফোন ধরলেন। মিনতিকে ডেকে দিতে বলে ফোন ধরে থাকল গণপতি। যদিও তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে মিনতি ঘুমিয়ে পড়েছে। সিনেমা দেখতে মিনতি ভীষণ ভালবাসে। তাকে এক-রকম সিনেমা পাগলই বলা যায়।

মিনিট দুয়েকের অপেক্ষা বড়জোর, তারপরই ভদ্রমহিলার যে গলা শোনা গেল, সে গলা আর চেনা যায় না। আতঙ্কে তাঁর গলার স্বর বুজে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি শুধু বললেন, 'আপনি এক্ষুণি চলে আসুন, আপনার মিসেস সেন্সলেস হয়ে ঘরের মেঝেয় পড়ে আছেন।' ব্যস, টেলিফোনের কানেকশন কেটে গেল। সেকেণ্ড তিন-চার গণপতি বিমূঢ়ের মত রিসিভার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি ধরল। পাড়ায় ঢোকবার মুখেই পরিচিত ডাক্তার ভদ্রলোককে তুলে নিয়ে স্ট্রেট বাড়ি। ফ্ল্যাটের মুখে প্রতিবেশীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদের দেখে তাঁরা পথ করে দিলেন। গণপতি তখনও জানে না, তার আসবার আগেই লালবাজারে খবর চলে গেছে। প্রতিবেশী ভদ্রলোক নিজের দায়িত্বে সেটা করেছেন। ওঁর স্ত্রী মিনতিকে ডাকতে গিয়েই দেখতে পেয়েছিলেন ফ্ল্যাটের দরজা খোলা, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। কলিংবেল টিপে সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকেই শিউরে ওঠেন। মিনতি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে যেভাবে পড়েছিল.. তা দেখেই তিনি সর্বনাশটা কল্পনা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তখনই গণপতিকে জানানো উচিত মনে করেন নি।

অনেকক্ষণ ধরে ফ্ল্যাশ বাল্‌বের বিদ্যুৎ চমকালো। তারপর অনেক খুঁজেপেতে ঘরের ভেতরের বিভিন্ন জায়গা এবং জিনিসের গা থেকে আঙুলের ছাপ নেওয়া হল। করচৌধুরী ফরেনসিকের সঙ্গে নিচু গলায় দু-চারটে বাতচিৎ করলেন। ফরেনসিকের ভদ্রলোক জলের গ্লাসটি পরীক্ষার জন্যে সঙ্গে নিলেন। করচৌধুরী তাঁর পকেট থেকে বের করে খামদুটো ওঁর হাতে দিয়ে বললেন, 'ভেরী আর্জেণ্ট. আপনার রিপোর্টের জন্যে খুব অ্যাংশাস থাকছি মনে রাখবেন।'

অ্যাম্বুলেন্স এসে গিয়েছিল। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্যে পুলিশমর্গে চলে গেল। গণপতি কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। পাশের ফ্ল্যাটের ওঁরা গণপতিকে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলেন। এই ব্লকেরই দুজন ভদ্রলোককে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করিয়ে রেখে করচৌধুরী আর এক দফা তল্লাসী চালালেন। এবার শুধু বসবার ঘর নয়, গোটা ফ্ল্যাটটাই একচক্কর ঘুরে দেখলেন। তিনি জানেন, টাকাকড়ি কিংবা গয়নাগাটি কিছুই খোয়া যায় নি। সুতরাং এটা ঠিক ডাকাতির কেস নয়। খুব ঠাণ্ডা মাথায় এই খুন করার পর সম্ভবত ধর্ষণ করা হয়েছে। সুতরাং হত্যাকারী যে মানসিক ভাবে সুস্থ নয়, এটা অনুমান করা যায়। জলের গ্লাসে কোন হাতের ছাপ পাওয়া যায় নি। তার অর্থ হত্যাকারী পরে গ্লাসটি মুছে রেখে গেছে। হ্যাঁ, সব মিলিয়ে তাঁর ধারণা হত্যাকারী একাই ছিল এবং হত্যাকারী মৃতার বিশেষ পরিচিত কোন ব্যক্তি। লোকটি রীতিমত শারীরিক ক্ষমতার অধিকারী।

চোখ বুজে দৃশ্যটা কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন করচৌধুরী। সিনেমায় যাবার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল মিনতি। এখন শুধু শোবার ঘরে গিয়ে সামান্য প্রসাধন পর্ব বাকি। তারপর হাতব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়া। ও ঘরে বিছানার ওপর হাতব্যাগটা নামানো রয়েছে, তার মধ্যে সিনেমার টিকিট, কিছু টাকাকড়ি আগে থেকেই ভরা আছে। এমন সময় কলিংবেল। দরজা খুলে যাকে দেখল মিনতি, সে তার অপরিচিত কেউ নয়। বসবার ঘরে নিয়ে এসে বসালো, পাখাটা

ছেড়ে দিল ফুলস্পীডে। আগন্তুক হেসে হেসে গল্প করে যাচ্ছে, কিন্তু তখনও মিনতি জানে না, এই লোকটির হাতে তার কি নিয়তি অপেক্ষা করে আছে। মিনতি সিনেমা দেখতে যাবে শুনে তাকে বলল, ঠিক আছে, একসঙ্গেই তাহলে বেরোন যাবে। তিনটে কাঠি খরচা করে একটা সিগারেট ধরাল। আসলে আসন্ন আক্রমণের মহলা দিয়ে নিচ্ছিল মনে মনে। কীভাবে কাজ সারবে, কীভাবে তার পরিচয়ের সূত্রগুলো মুছে দিয়ে পালাবে, তারই আটঘাট বেঁধে নিচ্ছিল, চারপাশ স্টাডি করে নিচ্ছিল। মিনতি শেষ তৈরি হয়ে নিতে ভিতরে গেছে। এমন সময় আগন্তুক চেঁচিয়ে একগ্লাস জল চাইল। মিনতি জল এনে দিল। জল খেয়ে গ্লাসটি সেণ্টার টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখেই নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটি।

বারকয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে করচৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন। এখানকার কাজ তাঁর শেষ হয়েছে আপাতত। গণপতিকে ডাকিয়ে আনলেন চলে যাবার আগে। টেলিফোন নম্বর আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নাম-ঠিকানা লিখে নিতে নিতে করচৌধুরী বললেন, 'আর একটা প্রশ্ন : আপনার বন্ধুদের কেউ কি জানতেন, আজ আপনারা সিনেমায় যাবেন?'

উত্তরে গণপতি প্রথমে না বলেছিল, পরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজন সেই রকমই জানে।'

করচৌধুরী সোজা হয়ে বললেন, 'কে তিনি? তাঁর সঙ্গে কি আজ আপনার দেখা হয়েছিল?'

গণপতি বলল, 'এই মাত্র যার নাম ঠিকানা আপনি লিখলেন, সেই সমীর লাহিড়ী। না, দেখা হয় নি, টেলিফোনে কথা হয়েছিল।'

'আচ্ছা! ডিটেল মনে করে বলতে পারেন আমাকে? জানি আপনার মনের অবস্থা কী রকম, হয়তো আপনার ওপরে টরচার করাই হচ্ছে, তবু আপনার পুরো সহযোগিতা ছাড়া আমাদের পক্ষে অপরাধীকে ধরা সম্ভব নাও হতে পারে। অথচ এই ধরনের একটা

নরপশু অবিলম্বে ধরা পড়ুক, তার প্রাপ্য কঠিনতম শাস্তি সে পাক, এটা নিশ্চয়ই আপনি চান।'

শোকে দুঃখে অবসাদে তোবড়ানো গণপতির মুখের রেখাগুলো প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায় কেমন কঠিন হয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার অসহায় আর করুণ দেখাল তার মুখ চোখ।

একটু পরে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি হয়তো আপনার কোন কাজেই লাগব না, কারণ আমি তো এ ব্যাপারের কিছুই জানি না। যদিও আপনি জিজ্ঞেস করেছেন বলেই বলব, তবু মিনতির হত্যার ঘটনায় সমীরের প্রশ্নই ওঠে না। তখন কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটে বাজে, কলম টলম গুটিয়ে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে আমি উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ক্লাব থেকে সমীর ফোন করল। আমি আজ—'

করচৌধুরী হাত তুলে গণপতিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি যদি হুবহু ডায়ালগগুলো বলতে পারেন, তাহলে আরও ভাল হয়।'

'বেশ'। বলে গণপতি সামান্য সময় চুপ করে থাকল। সম্ভবত তাদের দুজনের সংলাপগুলো ভেবে নেবার চেষ্টা করল।

করচৌধুরী সেই ফাঁকে বললেন, 'যত তুচ্ছই হোক, বলতে দ্বিধা করবেন না।'

গণপতি ঘাড় নেড়ে জানাল সে দ্বিধা করবে না।

—হ্যালো, কে ?

—গণপতি ?

—ইয়েস ! তা সমীরচন্দ্র, কী খবর ? কোথা থেকে ?

—মোল্লার দৌড় যে মসজিদ পর্যন্ত, সেই ক্লাব থেকে। আজ এখানে খুব জমেছে। একটু তাড়াতাড়ি অফিস কেটে চলে আয় না ? দুজনে একহাত বসি। আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আয়...এখন তোর বাজে কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটে...তিনটে নাগাদ তোকে এক্সপেক্ট করব।

—স্যরি সমীর, আজ হবে না। আমি এক্ষুণি বেরোব।

—কোথায় যাবি ?

—সিনেমা।

—সিনেমা ! অফিস পালিয়ে বাড়ি পালিয়ে শেষে সিনেমা ? কেমন যেন আমিষ-আমিষ গন্ধ পাচ্ছি !

—নো আমিষ। একেবারে পিওর ভেজিটেবল, যাকে বলে ডালডা, আমি পালাচ্ছি বটে, বাড়ি সঙ্গেই যাচ্ছে। কিন্তু তুই তো নিপাট ব্যাচেলার, আমিষ-নিরামিষের বুঝিস কি ?

—তা বটে ! তোরা বিয়ে করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিস, তিনখানা ন্যাজ গজিয়েছে—বলে যা ! [ফোনের মধ্যে একটা যাত্রা-মার্কা দীর্ঘশ্বাস পড়ল] আমাদের তাসের প্রাসাদ দিলি তো ধুলিসাৎ করে ! যাক, তোদের বায়োস্কোপ সুখের হোক। আগামী রোববার কিন্তু নিশ্চয় আসছিস, অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

'ব্যস ?' করচৌধুরী বললেন, 'দিস মাচ ?'

'দিস মাচ।' গণপতি বলল, 'এর বেশি আর এক অক্ষরও কথা হয় নি। দেখলেন তো, এই টেলিফোন সংলাপের মধ্যে আপনার কাজে লাগবার মত একটা বিন্দুও কিছু নেই।'

করচৌধুরী বললেন, 'কি যে কখন আপনাকে সাহায্য করবে, ইউ নেভার নো। এক ধরনের আনাজ আছে, যার খোসাতেই বেশি ভিটামিন। আপনার ক্লাবের নাম আর লোকেশানটা জানা দরকার।'

গণপতি বলল, 'বৌবাজার কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের কাছে একটা বাড়ির দোতলায় আমাদের ক্লাব। ক্লাবেরই এক মেম্বার তার বাড়ির এই ঘরটি আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। প্রতি শনি আর রবিবার আমাদের আড্ডা বসে। তাস, দাবা, ক্যারম চলে। ডিবেট, সাহিত্য আলোচনা, গান-বাজনাও হয়। ক্লাবের নাম ইনডোর। আমাদের যা কিছু সব চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ। তাই।'

'নামটা সত্যিই ইউনিক। ইনডোর। বাঃ।'

আরও দু-চারটে কথা সেরে করচৌধুরী বিদায় নিলেন।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলেন করচৌধুরী, ঘুম আজ তাঁর চোখের ত্রিসীমানার মধ্যে নেই। ছোট্ট একটা ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন কিছুতেই কজা করতে পারছিলেন না। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। ঘোলা এক হাঁটু জলে হাতড়ে হাতড়ে মাছ ধরতেন। মাছগুলোকে দেখা যেত না, কিন্তু থেকে থেকেই হাতেপায়ে চতুর ছোঁয়া পেতেন মাছের, পিছলে পালিয়ে যেত তারা। আজকের কেসটাও যেন সেই রকমই, অস্বচ্ছ জলের তলার মাছের সঙ্গে যেন কানামাছি খেলা! হত্যাকারীর এমব্রয়ডারীটা খুব সুন্দর, নিখুঁত নিপুণ সুতোর নকশা—কিন্তু করচৌধুরী জানেন, এই পুরো প্যাটার্নটার মধ্যে একটা চোরা সুতোর আলগা ফাঁস আছে। সেটা খুঁজে পেলে মাত্র একটা টানের মামলা, তাহলেই ফসফস করে গোটা বুনোনটা চোখের সামনে খুলে যাবে। কিন্তু কারচুপিটা তাঁর অঙ্কের ছাঁকনির ফাঁক দিয়ে ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। রাত দুটো।

চুরুট ধরিয়ে করচৌধুরী অন্ধকার ব্যালকনিতে এসে বসলেন। চোখের সামনে নক্ষত্র নিবিড় আকাশের ব্লোআপ। পাশের বাড়ির কার্নিস থেকে একজোড়া প্যাঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। করচৌধুরী আবার মাথার মধ্যে ছকটা সাজাতে লাগলেন।

গণপতি গাঙ্গুলী ঠিক আড়াইটে পর্যন্ত অফিসে ছিল। প্রমাণ ওর অফিসের সহকর্মীরা, প্রমাণ সমীর লাহিড়ী। সে টেলিফোন করেছিল। গণপতির অফিস থেকে তাদের বাড়ি আসতে হলে আধ-ঘণ্টা থেকে পঁচিশ মিনিট লাগেই। গণপতির টিকিটের কাউন্টার পার্ট পাওয়া গিয়েছে। সে যে সিনেমায় ঢুকেছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই। সুতরাং আউট অফ ডাউট। ডাক্তার বলেছেন, দুটো থেকে তিনটের মধ্যে মিনতির মৃত্যু হয়েছে। মিনতির হাতঘড়ি বন্ধ হয়েছিল, তাতে কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটে বেজেছিল। ঘড়িটা সেণ্টার টেবিলের সঙ্গে খুব জোরে চোট খেয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার ডায়েলের কাঁচটাও ফেটে যায়। তাই মনে হয়, মৃত্যুর সময় মোটামুটি ভাবে আড়াইটে।

সিনেমা হলে পৌঁছুতে গণপতিদের বাড়ি থেকে বাসে আধঘণ্টা, ট্যাক্সিতে মিনিট পনেরো লাগে। সুতরাং আড়াইটের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরোবার কথা চিন্তা করেই মিনতি সাজগোজ করেছিল।

এবার সমীর লাহিড়ী। স্পেশাল বাসের কুড়িয়ে পাওয়া টিকিটটা অবশ্য তাকে সামান্য ইঙ্গিত করে। টিকিটের নম্বর নিয়ে বাসের গুমটিতে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছিল। তা থেকে জানা গিয়েছে ওই 'এস' বাসটা ডানলপের দিক থেকে ধর্মতলা যাচ্ছিল। বাসটা গণপতিদের বাড়ির কাছের স্টপে আনুমানিক সওয়া ছুটো নাগাদ পৌঁছেছিল। পাঁচ দশ মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে, কারণ পথে জ্যামের জন্য কোন কোন স্টেজে বাসের ওরকম দেরি হয়ে যায়, আবার পরবর্তী স্টেজগুলোতে বাস জোরে চালিয়ে সময়টা অনেকখানি মেকআপ করে নিয়ে থাকে। ভাড়া এবং স্টেজ পাঞ্চ দেখে বোঝা যায়, টিকিটের মালিক ডানলপের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে বাসে উঠেছিল। সমীরের বাড়ি ডানলপ এলাকায়। ওদিকে গণপতির আর কোন বন্ধুস্থানীয় কেউ থাকে না। প্রাথমিক সন্দেহ তাই সমীরের ওপর বর্তায়। কিন্তু সমীর লাহিড়ী যে নির্দোষ, তার প্রমাণ তার অ্যালিবাই। সে আড়াইটের সময় গণপতিকে ফোন করেছিল, ফোনের মধ্যে তার গলা চিনতে পেরেছিল, টেলিফোনের সংলাপ সেই কথাই বলে। আর সে যে ক্লাব থেকেই টেলিফোন করেছিল, ক্লাবের একাধিক মেম্বার সে কথা সমর্থন করেছে। তিনি নিজের ক্লাবে গিয়ে ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। যদিও ক্লাবের একটা অলিখিত নিয়ম আছে যে আড্ডা দিতে বা খেলতে বসে কেউ ঘড়ি দেখবে না, কারো জরুরি দরকার না থাকলে নিজের নিজের হাতঘড়ি খুলে রেখে তবেই খেলতে বসবে। ঘনঘন সময় দেখলে মেজাজ এবং মনযোগ নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্যে ক্লাব ঘরের দেওয়ালে কোন ঘড়ি রাখা হয় নি। একটা টেলিফোন আছে অবশ্য, কিন্তু সেটা দোতলার সিঁড়ির মুখে, বসবার জায়গায়। নিশ্চিত করে কেউ সময় বলতে না পারলেও ছুটো বেজে যাবার কিছু পরে সমীর ক্লাবে এসেছিল

বলে তাদের ধারণা। কারণ দুটো নাগাদ বাড়ির ভেতর থেকে সবার জন্যে রোজ কফি আসে। এটা বরাবরের নিয়ম। সমীর এই কফি মিস করেছিল। কিছুক্ষণ এর ওর হাতের তাস দেখে সমীর টেলি-ফোন করতে যায়। ঘরের মধ্যে খেলা তখন খুব জমে উঠেছিল, কেউ আর ওর দিকে তাকায় নি, তবে মাঝেমধ্যে দু-চারটে কথা স্পষ্ট কানে এসেছে। সেই কথাগুলো করচৌধুরী নোট করে এনেছিলেন। মিলিয়ে দেখেছেন। গণপতির মনে করে বলা টেলিফোনের সংলাপের জায়গাবিশেষের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। সুতরাং গণপতি মিথ্যে বা ভুল বলে নি। অতএব গণপতি আর সমীর দুজনকেই সন্দেহের বাইরে রাখতে হচ্ছে। তাহলে বাকি রইল কে ?

অনেকক্ষণ আকাশ পাতাল ভেবে করচৌধুরী তাঁর চুরুট শেষ করে শুতে গেলেন। রাত শেষ হয়ে আসছে, এবার একটু ঘুমোনো দরকার। চিন্তায় চিন্তায় মগজ গরম হয়ে উঠেছে, চোখ জ্বালা করছে, হাই উঠছে। কিন্তু ঘুম নেই। বিছানায় গড়াতে গড়াতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। কখন যে ঘুম এল নিজেই টের পেলেন না।

আবছা ঘুমটাকে চুরমার করে টেলিফোন বেজে উঠল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন করচৌধুরী। ফরেনসিক। মন দিয়ে ওদের রিপোর্ট শুনলেন, তারপর 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে ফোন রেখে দিলেন। ফাইণ্ডিংস নতুন কিছু নয়। মৃত্যুর কারণ এবং সময় যা অনুমান করা গিয়েছিল। জলের গ্লাসে কোন পয়জন পাওয়া যায় নি। তবে সিগারেটের ব্যাণ্ড নির্ভুল ভাবে জানা গিয়েছে আর যে চুলটা মিনতি গাঙ্গুলীর কাঁকনের গা থেকে পাওয়া গিয়েছিল, সেটা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের কোন পুরুষের। লোকটি খুব সম্প্রতি চুল কেটেছে।

ভ্রূ কুঁচকে দেওয়ালের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন করচৌধুরী। সিগারেটের ব্যাণ্ড আর চুল কাটার খবরটা তাঁর সন্ত

পরিচিত একজনকেই আবার কোণঠাসা করছে। তবে কি অ্যালি-বাইয়ের মধ্যে কোন ধোঁকা আছে। না, হতেই পারে না। আপন মনেই মাথা নাড়তে লাগলেন।

যমুনা চা আর খবরের কাগজ দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দেবার আগেই কাগজ খুললেন অভ্যাসবশে। পৃথিবীতে সব কিছুরই স্বাদ বদলে যাচ্ছে দিনকে দিন। খবরের কাগজও এখন বিস্বাদ। লেখার মধ্যেও আর নিখাদ মাটির রস আর গন্ধ নেই। ফসফেট আর অ্যামোনিয়ার গন্ধ। কৃত্রিম প্রজনন। ভোরের কাগজ এখন আর খবরের নয়, বিজ্ঞাপনের। সব পাতা জুড়ে শুধু বিজ্ঞাপন। সত্যি এ আর পড়া যায় না। হেড লাইনগুলোয় মুভী ক্যামেরার মত চোখ বুলিয়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বিতৃষ্ণায়। চায়ে চুমুক দিয়ে কুটিল চোখে তাকিয়ে থাকলেন তালাক দেওয়া কাগজটার দিকে। প্রথম পাতাতেই প্রায় অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে ঘড়ির বিজ্ঞাপন। সচিত্র। ছবির ওপরে একটা ক্যাচি ক্যাপশন : টাইমস লকার—কিপস ইউ সেফ!

হঠাৎ ডিসের ওপর কাপটা হড়কে গেল, সামলে নিলেন কিন্তু খানিকটা চা চলকে পড়ল পাজামা-পাঞ্জাবিতে। করচৌধুরীর মস্তিষ্কের কোন গোপন কোষে যেন বিদ্যুৎ চমক দিয়ে গেল। এই ঘড়ির ব্যাপারেই কি একটা অসঙ্গতি যেন তাঁর অন্যমনস্ক চোখ ছুঁয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মনটা গ্রহণ করে নি। অনেক চেষ্টা করেও ভেবে পেলেন না।

চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, এমন সময় চাপরাশী এসে কালকের তোলা ছবিগুলোর এনলার্জমেন্ট দিয়ে গেল। সেগুলো দেখতে দেখতে একটা ছবিতে এসে ওঁর চোখ আটকে গেল। মৃতের বাঁ পাশ থেকে ক্লোজআপে ছবিটা তোলা হয়েছে। বাঁ হাতটা ক্যামেরার একেবারে সামনে, হাতঘড়িটা জ্বলজ্বল করছে, ডায়ালে চিড় খাওয়ার দাগ স্পষ্ট। ছুটো বেজে তিরিশ মিনিট, পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে। তাঁর ভ্রূজোড়াটা হঠাৎ কপালে উঠে স্থির হয়ে রইল

কয়েক সেকেণ্ড। একটা কঠিন হাসি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল ঠোঁটের ওপর।

ডি-সি ডি-ডি'র ঘরে ঢুকতেই ডেপুটি কমিশনার অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা জানালেন, 'আসুন, আসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম। বসুন। তারপর, এই মার্ডার কেসটা নিয়ে কিছু ভাবলেন?'

চেয়ারে বসতে বসতে করচৌধুরী বললেন, 'ভেবেছি।'

'বাঃ! আপনার ওপরে আমার অনেক আস্থা।' বেল বাজিয়ে দু' কাপ কফি আনতে হুকুম দিয়ে ফের বললেন, 'ব্যাপারটায় একটুও এগোন গেল?'

পকেট থেকে চুরুটের খাপ বের করলেন, 'গেল। ইন ফ্যাক্ট, শেষ পর্যন্তই এগিয়েছি। এখন শুধু এক চুলের অপেক্ষা।'

ডেপুটি তাঁর চেয়ারে খাড়া হয়ে বসলেন, 'বলেন কি? এখনও চব্বিশ ঘণ্টা কাবার হয় নি মিস্টার করচৌধুরী!'

'টাইম ইজ নো ফ্যাক্টর,' করচৌধুরী মৃদু হেসে চুরুট ধরালেন, 'এও এক ধরনের ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন, ক্রসওয়ার্ড পাজলের মত ঘরে বসেই সলভ করার ব্যাপার।'

কফি এসে গিয়েছিল। ডেপুটি বললেন, 'নিন, একটু কফি হোক। খেতে খেতে আপনার ফর্মুলা শুনি!'

'ফর্মুলাটা খুব সিম্পল। বলতে গেলে মৃতের হাতঘড়ি থেকেই শুরু। আপনি জানেন, ওই চিড় খাওয়া ঘড়িটা দুটো বেজে তিরিশ মিনিটে থেমে ছিল। তাতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই, খুব জোরে চোট খেলে ঘড়ি অনেক সময়েই বন্ধ হয়ে যায়, আমরা সবাই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু যেটা আমরা তখন কেউ লক্ষ্য করি নি, তা হচ্ছে ঘড়িটা উল্টো করে হাতে পরানো হয়েছিল। ইয়েস, পরানো হয়েছিল আই মীন ইট। হত্যাকারী স্বয়ং এই কাজটি করেছিল। সে তখন অন্য ব্যাপারগুলোয় এতই মনোযোগী ছিল যে, খেয়ালই করে নি ঘড়ির চাবিটা ওপরের দিকে না থেকে নিচের দিকে অর্থাৎ হাতের

আঙুলের দিকে রয়ে গেছে। আপনি হয়তো বলবেন, আমি কী করে এত নিশ্চিত হলাম যে এ ভুলটা তাড়াহুড়োয় মৃতা নিজেই করে নি? প্রমাণ এই…ঘড়িটায় কোন আঙুলের ছাপ নেই, ন্যাতা বুলোনো শ্লেটের মতই ধোয়ামোছা। কিন্তু হাত থেকে ঘড়িটা খুলে ফের পরিয়ে দেবার এমন কি জরুরি কারণ ঘটল? এর একটাই কারণ হতে পারে, হত্যাকারী মৃতার হাতঘড়িতে সময়টাকে বেঁধে দিতে চেয়েছিল। তার জন্যে ঘড়ি খুলতে হয়েছে, জোরে আছাড় মারতে হয়েছে। অবশ্য সময় তখন সত্যি সত্যি হয়তো আড়াইটে ছিল না। দুটো কুড়ি কিংবা পঁচিশ হবে। এই অ্যালিবাই তার কী দরকার? ঠিক ওই সময়ে সে অন্য কোথাও ছিল, এই তথ্য সে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।'

করচৌধুরী চুপ করলেন। চুরুটের মাথা থেকে ধূপের মত নীলচে ধোঁয়ার রেখা সিলিংয়ের দিকে উঠতে লাগল। কথাগুলো হজম করতে ডেপুটি কমিশনারের বেশ খানিকটা সময় লাগল। তিনি কোন কথা না বলে নিঃশব্দে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। শেষে বললেন, 'কী ভাবে? কার কাছে?'

'সেটা বুঝতে পারলাম তার টেলিফোন মুছে হাতের ছাপ নিশ্চিহ্ন করে রেখে যাওয়ায়। সে যদি দস্তানা-পরা হাতে এই কাজগুলো করত, তাহলে আমাদের অঙ্ক কিছুতেই মিলত না। যাই হোক, সে ওই ফ্ল্যাট থেকে একটা টেলিফোন করেছিল। অ্যালিবাই এসটাব্লিশড করার জন্যে।'

'কার কাছে?'

'গণপতির কাছে। সেই কোটেশান স্মরণ করুন ঃ…এখন তোর বাজে কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটে…তিনটে নাগাদ কিন্তু তোকে এক্সপেক্ট করব!'

'তার মানে! আপনি কার কথা বলছেন, মশাই?'

'স্থান গণপতির ফ্ল্যাট, কাল মধ্যাহ্ন আড়াইটে, পাত্র সমীর লাহিড়ী!'

ডেপুটি হো হো করে হেসে উঠলেন, 'আপনার তো বাহাত্তুরে ধরার বয়েস হয় নি, তবে এরকম স্মৃতিভ্রংশ হচ্ছে কেন? আপনি নিশ্চয় ভুলে গেছেন যে সমীর টেলিফোন করেছিল ঠিকই, তবে ওই ফ্ল্যাট থেকে না, ক্লাবের বাড়ি থেকে। একাধিক ক্লাব-মেম্বার নিজের কানে ওকে কথা কইতে শুনেছে।'

ডেপুটির দোষ নেই, এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় ঘরে বসে চাল ভাজা চিবোনোর মত কেউ যদি হত্যারহস্য শোনাতে থাকে, তাহলে সেটা আর রহস্য থাকে না, রূপকথার মত শোনায়। করচৌধুরী তাই ভদ্রলোকের হাসিতে কিংবা কথায় ক্ষুণ্ণ হলেন না। একই রকম নিরুত্তাপ গলায় বলতে লাগলেন, 'না, ভুলি নি নিশ্চয়। তবে ক্লাবের বন্ধুরা যে টেলিফোন সংলাপের টুকরো কথা শুনেছিলেন, তা দু নম্বরী। হত্যাকাণ্ড শেষ করে সমীর গণপতিকে যখন টেলিফোন করে, তখন সময়ের কোন কারচুপি ছিল না। তখন সত্যিই আড়াইটে। ফোনের রিসিভার মুছে রেখেই সমীর নিঃশব্দে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায়। মোড়ের মাথা থেকে ট্যাক্সি ধরে সোজা ক্লাবে। ফাঁকা রাস্তায় মিনিট পনেরোর বেশি লাগবার কথা নয়। মিনিট তিন-চার এর ওর পাশে বসে সিঁড়ির মাথায় টেলিফোন করতে যায়। ক্লাব বাড়ির ফোন নম্বরটাই ডায়াল করে। তারপর একটু আগে গণপতির সঙ্গে যে কথাগুলো হয়েছিল, সেগুলোই রিপিট করে। শুধু তফাত এই, মাঝে মাঝে দু-চারটে কথা উঁচু গলায় বলেছে, যাতে সেগুলো বন্ধুদের সবাই শুনতে পায়। কত কোল্ড ব্লাডে ক্রিমিন্যাল বুঝতেই পারছেন।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন ডেপুটি কমিশনার। তারপর হুঁসে ফিরে এসে প্রথম কথাই বললেন, 'তা হলে এক্ষুণি অ্যারেস্ট করতে হয়।'

করচৌধুরী মাথা নেড়ে বললেন, 'না! এখনও এক চুল প্রমাণ বাকি। আমি লোক পাঠিয়েছি। সে কৌশলে সমীরের একগাছা মাথার চুল যোগাড় করে আনবে। মিনতি গাঙ্গুলীর হাতের কাঁকনে লেগে থাকা চুলের সঙ্গে সেটা মেলাবার পর ওকে আপনি হাতকড়া পরাবেন। তবে ইউ রেস্ট অ্যাশিওর, আমার ক্যালকুলেশনে কোন ভুল নেই।'

ব্রজসুন্দরবাবুর জীবনে হ্যাবিট কোন দিনই সেকেণ্ড নেচার ছিল না, অভ্যাসকেই তিনি আদি প্রকৃতি করে তুলেছিলেন। ঘড়ির আগে আগে চলা তাঁর আজীবনের কুঅভ্যাসগুলির মধ্যে একটি, কথা দিয়ে কথা রাখা আর একটি। চিরকালই সব ব্যাপারে একদম এগিয়ে চলতে ভালোবাসেন বলে কোথাও সাতটায় অ্যাপয়েন্টমেণ্ট থাকলে পৌনে সাতটায় গিয়ে হাজির হন। এর ফলে ভাল মন্দ দুইই ঘটেছে তাঁর জীবনে। সে অন্য কথা, অনেক কথা, এখন থাক।

এখন হাওড়া ষ্টেশনের ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সকাল ছটা। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এক্সপ্রেস ছাড়তে এখনো দশ মিনিট বাকি আছে। তা থাকুক, ব্রজবাবু ইজ ব্রজবাবু। জানলার ধারের আসনে বসে তিনি

নিশ্চিন্ত মনে চুরুট ধরালেন। এইমাত্র এক পেয়ালা চা শেষ করেছেন, কাপটা এখনো জানলার ওপরেই নামানো, উর্দি পরা বেয়ারা এসে নিয়ে যায়নি। হোক ষ্টেশন, হুড়োহুড়ি, ব্যস্ততা, শেষ মিনিটের দৌড় তাঁর দুচক্ষের বিষ। গোটা বাঙালী জাতটাই এই করে মরল। শিরে সংক্রান্তি নিয়ে তার যত কাজ। অন্তিমকালে হরিনাম এই জাতটার বড় প্রিয়। রাত জেগে নাভিশ্বাস তুলে এগজামিনের পড়া মুখস্থ করবে, নাকে মুখে গুঁজে অফিসে ছুটবে পাছে হাজরে খাতায় লাল দাগ পড়ে যায়। লাষ্ট বাস, লাষ্ট ট্রেন, লেট ম্যারেজ, পদে পদে হোঁচট খাওয়া লেট লতিফ লাল দাগ খেতে খেতে পেছনটা জন্মের মত লালই হয়ে গেল।

তবু তিনি এই বাঙালীরই একজন এবং সেজন্যে তিনি গর্বই অনুভব করেন। এই সিদ্ধান্তে আসার পর গুনগুন করে একটা টপ্পার সুর ভাঁজতে লাগলেন। মনটা আজ তাঁর খুব ভালো আছে। অনেকদিন পর ছোট মেয়ে-জামাইকে দেখতে যাচ্ছেন, দাদুভাইকে কোলে নিতে যাচ্ছেন! রাউরকেল্লা থেকে জামাইবাবাজা দুর্গাপুর ষ্টীল প্ল্যাণ্টে জয়েন করেছে মাসখানেক হল। বড় কোয়ার্টার পেয়েছে। এসে ইস্তক দুজনেই বারবার করে যাবার জন্যে লিখছে। তাই চলেছেন। ব্রজসুন্দরবাবুর দুই ছেলে, দুই মেয়ে, জীবনে এবং সংসারে সকলেই প্রতিষ্ঠিত। সুখী পরিবার বলতে যা বোঝায় তাই। একটা ছিমছাম বাড়ি করেছেন সল্ট লেকে, রিটায়ার করার বছরেই। সেও বছর পাঁচেক হয়ে গেল। বউ-বউমা-নাতিনাতনী নিয়ে ভরা সংসারে মোটেই একলা মনে হয় না। চাকরি শেষ করার পর নতুন নতুন হবি নিয়ে দিব্য সময় কেটে যায়।

সকালে আকাশ চোখ মুছতে না মুছতে কেডস্ পায়ে দৌড়তে যান, বিকেলেও লম্বা চক্কর হেঁটে আসেন। তারপর বাগান গাছপালার তোয়াজ চর্চা চলে কিছুক্ষণ। তাস ফাসে তেমন রুচি নেই। কিছুকাল থেকে জ্যোতিষ নিয়ে মেতেছেন, হাত দেখাটা রপ্ত হয়ে এসেছে এক রকম। ব্যাপারটা খুব থ্রিলিং। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন এবং দুর্বোধ্য

ভাষা শিখে ফেলার মত। আর অফটাইমে একটু পরোপকারী চিকিচ্ছে মানে হোমিওপ্যাথি। এটা আগে থেকেই ছিল, এখন আর একটু ঝালিয়ে নিচ্ছেন। শরীর তো ব্যাধিমন্দিরই, বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে। বন্ধুবান্ধব চারপাশে বৃদ্ধ হয়েছে, আত্মীয় স্বজনও নেই নেই করে মন্দ না। তার ওপর গরীব দুঃখী ঝি-চাকর আছে। এ্যান্টিসোসাল এলিমেন্টদের হাতে বেঘোরে প্রাণ এবং পয়সা খোয়াবে কেন ওরা। মুখে অবশ্য ঠাট্টা করে বলেন আমার বাবা গুলিবারুদের ব্যবসা, সুযোগ পেলেই হাতের টিপ পরীক্ষা করি। তবে ভয় পাবার কিছু নেই, ছররাগুলি তো! বেঁধে বিঁধুক প্রাণে মরবে না।

এই ভাবেই চলছিল। আজ ১লা আশ্বিন! অবিশ্যি মেঘের তলায় তলায় আশ্বিন এসে গেছে অনেকদিন। ওরে বাবা যা বৃষ্টি হল এবার। অনেক দিন চুরাশী সালটাকে মনে রাখবে কলকাতার মানুষ। সে যাক, পুজোপুজো গন্ধ লেগেছে আকাশের গায়! মেঘ তার কালোটাকা সাদা করে ফেলেছে, রোদ্দুরে চাঁপা ফুলের রঙ ধরেছে। এ বয়সে আশ্বিন মাসেই নস্টালজিয়ার মোচড়, বাবার হাত ধরা ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়। কুমোর পাড়ায় একমেটে, দোমেটে তেল রং-ডাকের সাজ, শিউলি-শাপলার সঙ্গে নতুন জুতোর কামড় মিশে থাকে। পুজো যখন পাঁজি খুললেই নাকের ডগায় তখন কোথাও কারো হাতে টাইমটেবল দেখলেই গোয়ালন্দর ষ্টীমারের ভোঁ কানে এসে লাগে। পদ্মাপারের মানুষের বিপদ এখানেই।

অন্যমনস্ক ব্রজবাবু আবার ওপার থেকে এবারে ফিরে আসছিলেন, অতীত থেকে বর্তমানে কিন্তু ততক্ষণে দৃশ্যটি বদলে গেছে। জানলার ওপর থেকে কখন কাপটি অদৃশ্য হয়েছে। মাইক্রোফোনে গমগমিয়ে টেম্পো উঠছে, ঘড়ির কাঁটা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শেষ লাফের অপেক্ষায়। প্ল্যাটফর্ম এখন অফিসপাড়ার ব্যস্ত ফুটপাথ। জোয়ারের মত জলস্রোতের মাথায় হোল্ড-অল, সুটকেশ, অ্যারিস্টোক্রাট লাগেজ ভেসে আসছে যেন। বাঁশি হল, সবুজ রুমাল উড়ল, গাড়ি দুলে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে মোশান নিল। রিলে রেসের মত কে যেন

জানলার সমান্তরাল ছুটতে ছুটতে এসে জানলা গলিয়ে তার ব্রীফকেস ব্রজবাবুর হাতে সম্প্রদান করে দিতে দিতে বলল, 'কাইণ্ডলি স্যার, কাইণ্ডলি'—বাকি কথাগুলো গাড়ির শব্দের চাকায় বুঝি কেটে গেল। অপ্রসন্ন ব্রজবাবু এই লাষ্ট টাইমের প্যাসেনজারকে পরের মুহূর্তে আর দেখতে পেলেন না। সে ততক্ষণে বোধ হয় মানুষের জটপাকানো কোন দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলেছে।

ব্রজবাবুর কাছে এসে পৌঁছতে লোকটার একটু সময় লাগল।

পরনে শ্লেট কালার টেরিলিনের স্যুট, চিবুকে থিয়েটারী কায়দায় ফ্রেঞ্চকাট, চোখে আলো আঁধারেতে রঙ বদলানো পোলারাইজড চশমা। বয়স চল্লিশের মধ্যে। দাঁত বের করে বিজ্ঞাপনী হাসি হেসে হাত বাড়ালো, 'লট অফ থ্যাংকস। আমার ব্রাফকেশটা'—

বাঙালী! কথা না কইলেও চিনতে অসুবিধে হত না, এ সেই লাষ্ট মিনিটের বাঙালী। ব্রজবাবু হাসলেন না। সামনের খালি সীটের ওপর রাখা ব্রীফকেসটা দেখিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'ধন্যবাদ আপনার ঈশ্বরকে দিন। আর একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু আপনার লাইফটাও ব্রীফকেস হয়ে যেত!'

ব্রজবাবুর চেহারা রীতিমত রাশভারি। এক ধরনের ক্লাসিক্যাল রসিক মানুষের মত, মুখ বুজে থাকলেও ঠোঁটের বাঁকা রেখায় যেন কঠিন কোনো কৌতুক চাপা দেওয়া আছে। রগ চটানো জুলপি হীন মাথাটা পাকা চুলে ঘন কদম। খাঁড়ালো নাক, চোখে চশমা নেই কিন্তু ভ্রূকুটি আছে। ছেলে বউয়ের আবদারে গরদের পাঞ্জাবি আর ধাক্কাপাড়ের ধুতি পরেছেন সারাজীবনের অনভ্যাস সত্ত্বেও। মুক্তোর বদলে অবশ্য শ্বেত চন্দনের বোতাম, হয়তো পথে ঘাটে নিরাপদ বলেই। পাকা বেতের সলিড লাঠির মত ঋজু শরীর, ছ ফুটের কাছাকাছি হবে। রংটাও পাকা বেতের কথাই স্মরণ করায়। বুঝি স্বভাবটাও।

এই ভি. আই. পি. মার্কা চেহারার দিকে তাকিয়ে লোকটা থমকে থাকল কয়েক সেকেণ্ড। তার পর কমেডিয়ানের মত মজলিশী হাসি

হেসে বলল, 'ঈশ্বর আছেন কি নেই গড নোজ! তবে আপনার আশঙ্কা সত্যি না, রানিং ট্রেনে ওঠা আমার অভ্যেস আছে। বাই দি বাই' —পকেট থেকে টিকিটটা বের করে উল্টো পিঠটা দেখালো 'এই সীট নাম্বারটা কোন দিকে হবে বলতে পারেন ?'

রিজার্ভেশান নাম্বার দেখে ব্রজবাবু পুলকিত হলেন না। আঙ্গুলের ইশারায় ব্রীফকেস রাখা সীটটাকে দেখিয়ে দিলেন।

বাঙ্কের ওপর ব্রাফকেস রেখে দিতে দিতে লোকটি বলল, 'মাই গুডনেস! দেখুন কি রকম আশ্চর্য যোগাযোগ, চোখ বুজে কেমন ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছি। সেই সঙ্গে আপনার মত একজন রসিক সজ্জনের সঙ্গ পেয়ে গেলাম, এটাই কি কম কথা।'

লোকটার আপাদ মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ব্রজবাবু জবাব দিলেন, 'আমি রসিক এবং সজ্জন একথা আপনাকে কে বলল? বেরসিক আর দুর্জনও তো হতে পারি! এনি হাউ সহযাত্রী যখন, বসুন।'

লোকটা আর কথা বাড়ালো না, কিন্তু তার কপালেও ভাঁজ পড়ল। চশমার কাঁচের ওপিঠে চোখদুটোর ভাষা ঠিক পাঠোদ্ধার করা গেল না। কোটের পকেটে ভাঁজ করে রাখা খবরের কাগজখানা বের করে মুখ চাপা দিয়ে বসে গেল। নিজেকে গুটিয়ে নেবার এটাই সম্মানজনক শর্ট কাট। ব্রজবাবু নিজেও এক সময় খবরের কাগজের পোকা ছিলেন। চায়ের সঙ্গে ও জিনিসটা ছিল তাঁর উত্তেজক হজমি। রিটায়ার করার পর খবরের কাগজ কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। ততটা টান নেই, তবে পড়েন। কিন্তু পথেঘাটে এরকম ধ্যাস্টামি করে প্রতিবেশী সহযাত্রীর কানে সুড়সুড়ি দিয়ে নয়, ঘরে শুয়ে বসে জিরেন কাটার সময়ে পড়েন।

ব্রজবাবু আর লোকটাকে নিয়ে মাথা ঘামালেন না।

গাড়ির স্পীড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনে মনে ছোট জামাইয়ের না দেখা কোয়ার্টারে পৌঁছে গেলেন। পূজোর জামাকাপড় আর সন্দেশের বাক্স নামিয়েই টাল মাটাল পায়ে হাঁটা দাদুভাইকে কোলে

তুলে নিলেন। যেমন করে একদিন নিজের ছেলেমেয়েদের একে একে তুলে নিয়েছেন বুকের মধ্যে। এই তো সেদিন, মনে হয় আজ-কাল-পরশুর ঘটনা। দেখতে দেখতে জীবনে সত্যি সত্যি এরকম বিকেল হয়ে আসে, সন্ধ্যে নামবো নামবো করে। একটা ঘর ছড়িয়ে যায় অনেক ঘরে, একটা বড় বট বাড়ে তার শাখা প্রশাখায়।

এর চেয়ে ফাস্ট লাইফ আর কি হতে পারে? একটা মোম পুড়তেও বুঝি এর চেয়ে বেশী সময় লাগে। বুঝতে না বুঝতেই যেন থার্ড জেনারেশন এসে গেল। একেই হয় তো বলে থার্ড ডাইমেনশন। নজর বদলানো থার্ড আই! ব্রজবাবু প্রাণপনে নিজেকে বুড়ো ভাববার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। মনে হল বাইরের খোলসটা মিথ্যে, ভেতরে সেই কাঁচা ভাবটা রয়েই গেছে। বরফের ছাদের তলায় টলটলে নীল জল। এ যেন পাহাড় সমুদ্র-ডিঙিয়ে বহু দূরদেশ দর্শনের পর ভেতর থেকে কেউ বলছে তবু ভরিল না চিত্ত। ধ্রুপদ খেয়াল যাই গাও না কেন বাপু, শমে আবার ফিরে আসতেই হয়, নইলে বুড়ী ছোঁয়া হয় না। তাই আবার শৈশব-কৈশোরে অনুষঙ্গে ফিরে আসা।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেও উদাস অন্যমনস্ক ব্রজসুন্দর তাঁর আশেপাশে বসে থাকা যাত্রীদের উসখুস নড়াচড়া এবং গুঞ্জন টের পাচ্ছিলেন। হঠাৎ হুঁশ ফিরতে তাকিয়ে দেখলেন কম্পার্টমেণ্টের এপাশটার দৃশ্য বদলে গেছে। তাঁর মুখোমুখি বসা লোকটা খবরের কাগজ অন্যের হাতে চালান করে দিয়ে জায়গা বদল করে ফেলেছে। আতস কাঁচ দিয়ে এক ভদ্রমহিলার হাত দেখছে। দু তিনজন প্রায় হুমড়ি খেয়ে বসে কর রেখা বিচার দেখছে। এবং দুচারটে ছুটকো প্রশ্ন করছে। একটু তফাতে আর একটি যুবক তার জিনসের প্যাণ্টে হাত মুছতে মুছতে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যে মনে হচ্ছে এই মহিলার পরই তার পালা।

ব্রজসুন্দরবাবু নিজের মনে হাসলেন। হাত পাতা বাঙালীকে ইদানীং এই এক সংক্রামক মুদ্রাদোষে পেয়েছে!

সরকারী বেসরকারী সব অফিসেই এখন কার্যোদ্ধারের জন্যে গেলে বাঁ-হাত দেখতে হয়। ছোট বড় মাঝারি—যার যেরকম চাবিকাঠি, তার হাত সেই অনুপাতে লম্বা। ফেল কড়ি মাখো তেল। শুধু ঘুষ ঘুষ আর ঘুষ। বাঁ হাতের ক্ষিদে আর মেটে না। এক এক সময় মনে হয়, গোটা দেশটাই বুঝি কবে এবং কিভাবে ন্যাটা হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ হস্তও কম যায় না। এই স্পর্শকাতর, সেন্সিটিভ ডান হাতটিও বাঙালী পেতেই আছে ভবিষ্যতের ফোরকাস্টের জন্যে। জ্যোতিষী দেখলেই তার হাতের তালু চুলকোয়, যেন এও এক ধরনের লটারির টিকিট।

এখন অবশ্য ঘরে ঘরেই হাত দেখনেওয়ালা গজিয়েছে, গায়ে-পড়া পাণিপ্রার্থী। দুপাতা কিরো পড়েই ছেলে-ছুকরীদের হাতটান হয়েছে। অথচ বাজালে দেখা যাবে, হস্তাক্ষর জ্ঞানও হয়নি, সবে ভুরু-কুঁচকে তাকাতে শিখছে। সেই সঙ্গে লাগসই দুচারটে বুলিবচন।

ছক কুষ্ঠি পাথর টাথর আজকাল ফ্যাশান হয়েছে। কালো টাকার সঙ্গে সঙ্গে স্টোনকালচার গ্রো করেছে। ব্রজবাবুর ভাষায় স্টোনচীপসের কারবার রবরবা চলেছে। দুহাতের আট আঙ্গুলে পরেও আশা মিটছে না। কোমরে ঘুনসী হাতে তাগা বাঁধার মত দৃশ্য অদৃশ্য সর্বত্র ঝোলানো হচ্ছে।

সামান্য কৌতূহল বশতই ব্রজবাবু চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিলেন। রঙীন কাঁচের ভিতর দিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল পলকের জন্য। সে তখন মাস রিডিং-এ ব্যস্ত, পাইকারী হারে হাত দেখা চলে। মহিলাটিকে ঠাণ্ডা করে সে তখন জিনসকে ধরেছে। শনিমঙ্গলের প্যাঁচ, দশা-অন্তর্দশা, তুঙ্গীবক্রী নিচস্থ দৃষ্টি আর ঘর বদলের সালতামামি চলেছে। আর একবার চোখে পড়তেই ব্রজবাবু তারিফের হাসি হাসলেন, সে হাসি ব্যঙ্গের কিনা বোঝা গেল না।

'না, এভাবে হয় না, এতো ওজন মেশিন নয়, যে পয়সা গলালেই টিকিট বেরিয়ে আসবে। লার্জ স্কেলে হাত দেখলে ইনটুইশান নষ্ট

হয়ে যায় !' কথাটা তাঁকেই লক্ষ্য করে বলা, তাছাড়া অপ্রিয় সত্য হচ্ছে থ্যাংকলেস জব !'

ব্রজবাবু বললেন, 'আপনি একটি জিনিয়াস।'

কথাটার মধ্যে বলাই বাহুল্য শ্লেষ ছিল, লোকটি ধরতে পারল না। লজ্জিত ভঙ্গি করে বলল, 'কী যে বলেন, জ্যোতিষশাস্ত্র হচ্ছে সমুদ্র, সবে নুড়ি কুড়োচ্ছি। দিন, আর একটা মাত্র হাত দেখবো, দিস ইজ লাস্ট।'

ব্রজবাবু মাথা নাড়লেন, 'গোরস্থানের দিকে যে পা বাড়িয়েছে তার হাত নিয়ে আর টানাটানি কেন ভাই !'

'মাপ করবেন, এখনো টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এ্যাট এ ষ্ট্রেচ চালিয়ে যাবেন ! আপনি দীর্ঘায়ু দূর থেকেই দেখে নিয়েছি। সেঞ্চুরিও জুটে যেতে পারে কপালে। আপনার তো রাজার হাত মশাই, সঙ্কোচ করে লুকিয়ে রেখেছেন কেন ? কই দেখি।'

'তা ঠিক'। ব্রজবাবু হাসলেন, 'আমি নিজের সংসারে রাজাই বটে। আমার কোন দুঃখ অভাব কিংবা সমস্যা নেই। তবে…না আচ্ছা দেখুন, পরে বলছি—

লোকটা ব্রজবাবুর পাঞ্জা নিজের হাতে তুলে নিতে নিতে এক ঝলক তাঁর মুখের দিকে তাকালো। খানিকটা সন্দিগ্ধ আর সন্ধানী সেই দৃষ্টি। হঠাৎ ব্রজবাবুর মনে হল এই মানুষটিকে তিনি কোথাও দেখেছেন, নিশ্চয়ই দেখেছেন। তাঁর চোখ কান ঠিক এই মুহূর্তে ধরিয়ে দিতে পারছে না বটে কিন্তু ষষ্ঠ চেতনায় কেমন একটা অদ্ভুত ভাইব্রেশন ফিল করছেন। সেটা কেবল মুখ চেনা মানুষ হলে ঘটতো না, নিশ্চয় গভীর কোন সূত্র আছে সেই স্মৃতির, যা তাঁর মস্তিষ্ককে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে ছুঁয়ে গিয়েছিল এক দিন। এবং তাঁর এত দিনের অভিজ্ঞতা যদি ভুল না করে থাকে, এই মানুষটার কাছেও তিনি পরিচিত ঠেকেছেন। এই মানুষটাও এই মুহূর্তে স্নায়বিক অস্বস্তিতে ভুগছে। হাতের ওপর হাত তুলে নেবার সময় মৃদু ভূকম্পনের মত ওর ত্বকের নিচে এক সূক্ষ্ম কম্পন ধরা পড়ে গেছে।

লোকটা অবশ্য এখন তাঁর হাতের ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে আছে। সরু মোটা খণ্ড অখণ্ড অনেকগুলো রেখার যোগ বিয়োগে তৈরী হয়ে আছে গাণিতিক তাৎপর্যে ভরা এক মিশ্র জ্যামিতি। একটা প্রায় সম্পূর্ণ জীবন চিত্রও বলা যায়। কিংবা চলচ্চিত্র। রেখাগুলো হাতের তালুতে স্থির হয়ে আছে, অনড়, যেন আবহমান কালের। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নাকি আলোর গতির চেয়েও দ্রুত গতিতে তারা চলেছে বলেই তাদের বেগ এবং আবেগ কোনটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই অমোঘ গতিতে ছুটে যাওয়া রেখা নির্ভুল লক্ষ্যে ছুটে যেতে যেতে মাঝে মাঝে পথ বদলাচ্ছে, চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। জেট প্লেনের মত ধোঁয়ার রেখাটা কিছুক্ষণ ভেসে থাকছে কালযাত্রার মহাশূন্যে। লোকটা এত কিছু নিশ্চয় ভাবছে না, কবি কিংবা দার্শনিক হলে ভাবতো। লোকটা ধূর্ত, স্মার্ট, প্র্যাকটিক্যাল। তার বেশী কিছু না। ভালো বলতে পারে, কথায় পালিশ আছে।

'আরে মশাই ঠিকই ধরেছিলাম,' লোকটা মুখ তুলে তাকালো, 'আপনি খুব সহজ লোক নন।'

'তা ঠিক, আমি একটু কঠিনই বটি।'

কথা বলার ধরনে আশপাশের কৌতূহলী সহযাত্রীরা হেসে উঠলেন।

'না সেকথা বলছি না। আপনি কোন সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে এক সময় নাম করেছিলেন। সকলের সামনে ভেঙে বলছি না, বুঝে নিন, মিলেছে কিনা। এখন তো আপনার রিটায়ার্ড লাইফ। হুঁ গান-বাজনারও শখ আছে দেখছি। ভেতরে রস আছে। তবে আয়েসী না, মেজার্ড লাইফ। ও বাবা, এক গুঁয়ে। করেঙ্গে টাইপের মানুষ। বাড়ি করেছেন? করেন নি? করেছেন, করেছেন। আমার কাছে লুকিয়ে লাভ কি? হাউস অবধারিত, ছবির মত দেখতে পাচ্ছি যে। হুঁ জীবনে অনেক ফাঁড়া গেছে আপনার।'

'এখনো যাচ্ছে।' ব্রজবাবু টিপ্পনী কাটলেন, 'আপনার হাত থেকে বাঁচলে হয়।'

'বাঁচবেন বাঁচবেন। আমি যাকে মারি, বেশী ক্ষণ কষ্ট দিই না।'

'কি করা হয়?'

'একসপোর্ট ইমপোর্ট।'

আসর জমে গিয়েছিল। সবাই খুব এনজয় করছিল, হাসছিল ওঁদের কথা শুনে। দুই রসিকের সাথ সঙ্গত, রসের ঠোকাঠুকি। ব্রজবাবু এমনিতে গম্ভীর কিন্তু কথার পিঠে কথার চাল ভুল করেন না। আমুদে চেহারাটা তখন বেরিয়ে পড়ে।

'পাথরের ব্যবসা আছে নাকি?'

'কেন?'

'নুড়ি কুড়োচ্ছেন বলছিলেন না! তাই ভাবলাম হাত যখন ধরেইছেন স্টোন চীপসও আছে।'

'না, তবে একটা হীরে ধারণ করলে ভাল হয়।'

'পারব না, লাগবে।'

'হীরে পরলে লাগবে?'

'লাগবে না? অনেক টাকা লাগবে।'

'তা ঠিক, হাজার পাঁচেক তো বটেই। ইস'—

'কী হল?'

'আপনার মনটার মধ্যে একটা খিঁচ রয়ে গেছে।'

'গেছেই তো, কিন্তু কেন? বলুন সেটা—'

'অল্পকালের মধ্যে আপনার কোন প্রপার্টি নষ্ট হয়েছে।'

'ওয়াণ্ডার! আপনি ঠিক বলেছেন, হয়েছে। তবে এত লোকের সামনে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, আমার সেই আজীবনের সঞ্চয়, সেই আগলে রাখা প্রপার্টি স্রেফ নারী ঘটিত কারণে খুইয়েছি। এর জন্য খিঁচই বলুন আর খচই বলুন আছে, এই বুকের মধ্যে আছে।'

চাপা হাসি আর গুঞ্জনের মধ্যে জিন পরা ছোকরাটি উঠে এসে ব্রজবাবুর পায়ের ধুলো নিল, 'দাদু, একটু ছুঁয়ে দিন। এই বয়সেও আপনার কলজে আছে। তা আমাদের একটু কিসসাটা শুনিয়েই দিন না।'

আবহাওয়া ইচ্ছে করেই ব্রজবাবু তরল করে এনেছিলেন। জিনে পাওয়া এই জেনারেশনের রুচি-পসন্দই আলাদা। তাপ্পিমারা ওই ফেডইন ফেডআউট প্যান্টগুলো দেখলেই মনে হয় কোন ভিস্তিওয়ালা মশক বেয়ে নিয়ে চলেছে।

ক্ষুরধার হাসি হেসে বললেন, 'ইয়েস মাই গ্রাণ্ড সন, আমার ও ব্যাপারে কোন ঢাক গুড় গুড় নেই। শোনো তবে। থার্টিজের মডেলের একখানা মার্ক টু ছিল আমার জবর দখলে।'

কথার মাঝখানেই ছোকরাটি বলল, 'বুঝেছি রেসিং কার।'

'ছাই বুঝেছ?' রেসিং নয়, গ্রেসিং বলতে পার। ফাদারের কাছ থেকে ইনহেরিট করেছিলাম, তবে সেটা কার নয় উইচকার। তোমাদের এই মাকুন্দা জেনারেশন তার গ্র্যাভিটি ঠিক ধরতে পারবে না। মনে কর দুখানা মিনি ফুলঝাড়ু দুপাশে—বলে হাত দিয়ে নির্মূল করে কামানো ওষ্ঠের দুপাশটা দেখালেন, 'কেউ আমাকে বাঙালীই ঠাউরাতো না। "গোঁফ দিয়ে যায় চেনা"—বাজে কথা! আমাকে কেউ চিনতে পারেনি। ভদ্রমহিলাও। গালে সুড়সুড়ি লাগে এই অপবাদ দিয়ে ওটিকে তিনি তালাক দেওয়ালেন। সত্যি পুরুষ জাতটার চেয়ে রামমুখ্যু প্রাণী জগতে বিরল। আমি লোক লাগিয়ে গোঁফজোড়া নির্মূল করলাম। ফলে গোঁফও গেল নায়িকাও গেল।'

ছোকরা সোৎসাহে বলল, 'কেন? কেন? নায়িকা বেগড়ালেন বুঝি?'

'না। বেগড়াননি। তিনি আর আমাকে চিনতেই পারলেন না। গোঁফ ছাড়া আমাকে নাকি দাদু বলে চেনাই যায় না। তাছাড়া তাঁর হামি খাওয়ার বয়সও আর এখন নেই। এবছর ক্লাস সিক্সে উঠেছে।'

এক ঘটি ঠাণ্ডা জল যেন মাথায় ঢেলে দিলেন ছোকরার। শুধু ছোকরারই নয়, মডার্ন জ্যোতিষীও টেম্পো হারিয়ে ম্রিয়মান হয়ে গেলেন। তাঁর ইমেজ নষ্ট হয়ে গেল। তবে বয়স্ক শ্রোতারা খুব একচোট হাসলেন ব্রজবাবুর গুম্ফ নিধনের কাহিনী শুনে।

হাত দেখা পর্বের ইতি হলেও আলাপ জমে উঠলো ওখান থেকেই। লোকটির নাম সুরপতি পাঠক।

পাঠক তো পদবী। আসলে চ্যাটার্জি। বামুনের ছেলে। ব্যবসাটাও ছেলেখেলার। মানে খেলনার। দেশ বিদেশের পুতুল আর রকমারী খেলনা খোঁজখবর করে আনানো আর বাইরে চালান দেওয়ার মধ্যে একটা বাড়তি আনন্দ আছে।

'আপনি তো দুর্গাপুরে যাচ্ছেন, আসুন না একদিন আসানসোলে। আপকার গার্ডেনে থাকি।'

ব্রজবাবু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'দেখি সময় পাই তো বেড়িয়ে আসবো একবেলা।'

'খুব খুশী হবো আপনি এলে।'

ঠিকানা আদান প্রদান হল। রেলগাড়ির এই এক মজা। দু দণ্ডের মুখোমুখিতেও ঘনিষ্ঠ মানুষের মত পরিচয় হয়ে যায়। মোটা সোনার বাঁটের মত সিগারকেসটা বের করলেন ব্রজবাবু। খাঁটি বর্মী চুরুট, ফাউণ্টেন পেনের মত সরু সাইজ, বাদামী রঙে বেশ মাদকতা আছে। রেঙ্গুন থেকে তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু পাঠিয়েছেন।

'চলবে নাকি একটা?'

সুরপতি বলল, 'বাঃ দেখি দেখি! আপনার কেসটা তো ভারী সুন্দর। রিয়্যাল গোল্ড নাকি?'

'অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট...বুঝলেন না...তবে এর শেপ-এর ফিনিশিং আর প্লেটিং সত্যিই রিমার্কেবল্।'

কেসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সুরপতি একটা সিগার তুলে নিল।

খবর না দিয়ে আসা, তাই স্টেশনে জামাতা বাবাজী গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতে পারেনি। ট্যাকসি নিয়ে টাউনশীপের এক প্রান্তে শর্ট রোডের বাংলোয় যখন পৌঁছালেন তখন শ্রীমান কারখানা চলে গেছে। কম্পাউণ্ডের মধ্যে মা আর ছেলের লুকোচুরি খেলা চলেছে। দোপাটি ফুলে ফুলে আলো করে রেখেছে বাংলোর বারান্দার

দুপাশ। ছাঁটা ঝাউ আর রঙ্গনের থাম্বাগুলো পেরিয়ে এসে কতকগুলো কাজু বাদামের গাছ, এখনো মানুষের মাথা ছাড়িয়ে ওঠেনি, ডাল আর কাঁঠালের মত চকচকে পাতা ছাতার মত ছড়িয়ে রয়েছে। এরই মধ্যে টালমাটাল পায়ে ছেলে দৌড়োচ্ছে টুকি দিতে দিতে, পেছনে পেছনে তার মা, হাতে খাবারের বাটি। এমন দৃশ্য দুর্লভ। ব্রজবাবুর মনে হল তাঁর জীবনে ছবিটা উলটে গেছে। খাবারের বাটি ফেলে রেখে, মা নিজেই লুকিয়ে পড়েছেন, আর তিনি খুঁজছেন।

ফটকের কাছে ট্যাকসির আওয়াজ পেয়ে সুতপা মুখ তুলে তাকিয়েছিল। হয়তো কেউ কোয়ার্টার খুঁজছেন। তারপরে যিনি গাড়ি থেকে নামলেন তাঁকে ঠিক বাবার মত দেখতে ভেবে সুতপা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কটুস হাততালি দিয়ে চেঁচালো, 'মা গ্যাকো গ্যাকো ট্যাক্সি খালি।'

ইন ফ্যাক্ট ব্রজবাবুকে কোয়ার্টার খুঁজতে হয়নি নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে আন্দাজে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে ফার্ষ্ট চান্সেই সুতপাকে দেখতে এবং চিনতে পেরে গিয়েছিলেন। মালপত্র নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছেন, ঠিক তখনি সুতপা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে লোহার গেট খুলে বেরিয়ে এল, 'ওমা! বাবা তুমি! আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না! রাখো রাখো হরি নিয়ে যাবে। হরি! অ্যাই হরি।'

বারো তের বছরের ময়লা রং ছিপছিপে হরি বাড়ির ভেতর থেকে দৌড়ে এসে মালপত্রের কাছে দাঁড়াল। বৃদ্ধ ড্রাইভার বাপ মেয়ের মিলনের দৃশ্য দেখতে দেখতে গাড়ি ব্যাক করে ঘুরিয়ে নিল, তারপর যেন হাজার মাইল দূরের বুকের ভেতর অবদি উস্কে দেওয়া স্মৃতির ইলাষ্টিক জোর করে ছেঁড়ার জন্যেই টপ স্পীডে উধাও হয়ে গেল। ব্রজবাবু এগিয়ে গিয়ে দাদুভাইকে কোলে তুলে নিলেন।

সুতপা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কারখানায় ফোন করে দিয়েছিল। স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে সবে দ্বিতীয় দফা চায়ের কাপ হাতে পেয়েছেন, হীরক এলো। মোটর বাইক দাঁড় করিয়েই ছুটে এসে

ঘরে ঢুকলো। হীরক সত্যিই হীরের টুকরো ছেলে। সুঠাম ঝকঝকে চেহারা, এই বয়সেই ইঞ্জিনীয়ার র‍্যাঙ্ক পেয়েছে। ফুয়েল ইঞ্জিনীয়ার। ইউ কে ঘুরে এসেছে। আরও একবার বোধ হয় বাইরে যাবে! পায়ে হাত রেখে প্রণাম করল। খবর না দিয়ে আসার জন্যে অনুযোগ করল। কোয়ার্টার খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হয়নি তো, পথে কোন কষ্ট হয়েছে কিনা, সল্টলেকের সবাই কে কেমন আছে খুঁটিয়ে জেনে নিল। ও আজ আর কারখানায় যাবে না, চার্জ হ্যাণ্ড ওভার করে এসেছে এক বন্ধুকে! উপহারগুলো এক এক করে দেখালো সুতপা। হীরক শুধু বাঃ! আরিব্বাস! কী সুন্দর! ফার্স্ট ক্লাস! করে গেল। কটুসের জন্যে একগাদা খেলনা। ভীম নাগের অর্ডারী সন্দেশ আর নবীন ময়রার রসগোল্লার টিন, কেকের বাক্স। সুতপার জন্যে খান তিনেক দামী শাড়ি, হীরকের জন্যে সুট পীস ছাড়াও কখানা ঝকঝকে পেপার ব্যাক এসেছে দেখে আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠল। বলল, 'সবচেয়ে ভাল উপহার এইটেই। এখানে গল্পের বইয়েরই দুর্ভিক্ষ। জানেন বাবা, সেই ছেলেটার মত ছড়া কেটেই বলছি, এই হচ্ছে আমার সেরা খাদ্য, পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়!'

ব্রজবাবু হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই ফ্রিজশটের মত থেমে গেলেন হাসির মাঝখানে। সুতপা অবাক চোখে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা! কী হল তোমার?'

হীরক চমকে তাকাল, ভয়ও পেল। গত সপ্তাহেই তাদের ডিপার্টমেন্টের ঘোষবাবু এই রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন। মগজের তার ছিঁড়ে গেলে চোখের পলকে লোডশেডিং হয়ে যায় কখনো কখনো। শেষে মেয়ের বাড়িতে এসে ভদ্রলোক—না। ওসব কিছু না। ব্রজবাবু কথা বললেন।

'তপু মা, ও ঘর থেকে আমার জামাটা নিয়ে আয় তো।'

সুতপা অবাক, 'জামা কেন?'

'নিয়ে আয় না, দরকার আছে।'

সুতপা হ্যাঙ্গারে ঝোলানো পাঞ্জাবিটা নিয়ে এল হ্যাঙ্গার সুদ্ধই। ব্রজবাবু জামাটা হাতে নিয়ে আগে সোফায় বসলেন। তারপর বাঁ পকেট থেকে রুমাল বের করে সেই রুমালের সাহায্যে কিছু একটা বের করতে করতে স্বগতোক্তি করলেন—'আছে না ভ্যানিশ হয়েছে কে জানে! ইস তখনো যদি ব্যাপারটা মাথায় আসতো!'

সুতপা আর হীরক দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে ব্রজবাবুর কাণ্ড দেখছিল।

'কি ওটা বাবা?' সুতপার মুখ দিয়ে বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এল, 'একি! সোনার বাঁট তুমি কোথেকে পেলে? আর সারা রাস্তা এভাবে পকেটে করে নিয়ে এসেছ! তোমার কি প্রাণের মায়া বলতে কিছু নেই?'

'দূর পাগলী, এই আমার সিগার কেস।'

ব্রজবাবু অদ্ভুত কৌশলে, প্রায় হাত না লাগিয়ে কেসটা খুলে ফেললেন। তারপর তার ভেতর থেকে একটি একটি করে চুরুটগুলো বের করে নিলেন। কেসটা এবার বন্ধ করে সাবধানে রুমালে মুড়ে ফেললেন।

হীরক এতক্ষণ পরে কথা বলল, 'কী ব্যাপার হল? মানেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, বাবা!'

ব্রজবাবু বললেন, 'যদি মুছে গিয়ে না থাকে তাহলে এই বাক্সের গায়ে এমন এক মহাপ্রভুর হাতের ছাপ আছে যিনি আমাকে এক দিন খুব নাচ নাচিয়েছিলেন। চাকরি জীবনে অনেকবার অনেক প্যাঁচে পড়েছি কিন্তু কেউ আমাকে এরকম বোকা বানাতে পারেনি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ধরেও ছিলাম ব্যাটাকে, কিন্তু আমার আনা চার্জ শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকলো না। আদালতের ফস্কা গেরো খুলে ঠিক বেরিয়ে গেছে।'

হীরক হেসে ফেলল, 'বাবার বোধ হয় ঠিক স্মরণ নেই।'

'কি স্মরণ নেই?'

'আপনি রিটায়ার করেছেন।'

ব্রজবাবু মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'ভুলিনি। একথা কি কেউ কখনো ভোলে? মানুষ বিয়ের তারিখ ভুলে যায় হয়তো, কিন্তু রিটায়ারমেণ্ট ভোলে না। ঠিক পাঁচ বছর তিন মাস সতের দিন আগে আমার চাকরি জীবন খতম হয়েছে। একসটেনশনের অফার দিয়েছিল, নিইনি।'

'তাহলে? ওই হাতের ছাপ এখন আপনার কোন্ কম্মে লাগবে? বঁড়শি থেকে ছুটে যাওয়া মাছের পেছনে ছুটে আপনি কি করবেন? আর পাঁকাল মাছটিকে আপনি পেলেনই বা কোথায়? তার হাতের ছাপই বা আপনার চুরুটের বাক্সে এলো কি করে?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন হীরকের কথাটা। প্রশ্নটা মোক্ষম কিন্তু তারও জবাব আছে। কিন্তু উত্তরটা মনের মধ্যেই থাকল, বললেন না। 'প্রফেশন হচ্ছে এক ধরনের শ্লো পয়জন, রক্তে মিশে যায়। তাই প্রফেশনাল মানুষের মুক্তি নেই, অবসর কিছু নেই। চাকরি ছুটে ফুটে যায় কিন্তু চাকরির ভূত কাঁধে চেপেই থাকে। বাঘ যখন প্রফেশনাল হয়ে যায় তখন সে হয় ম্যানইটার, তার পক্ষে রক্তের স্বাদ ভোলা সম্ভব নয়। পুলিশের চাকরি মানেই ম্যান হাণ্টিং এক অর্থে। শিকারী বন্দুক বেঁধে ফেললেও শিকার থামে না, শিকারীকে হণ্ট করে বেড়ায়। যেমন ঘটেছে আমার বেলায়। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে অ্যাসিসট্যাণ্ট কমিশনার হয়েছিলাম। নিজের কাজ ছাড়া কোন দিকে তাকাইনি। ব্রজসুন্দর চন্দ্র ওরফে নিকনেম বি. এস সি কে ভালো মন্দ দু তরফের মানুষই হয় সমীহ করে নয় সমঝে চলতো। থাক সে কথা।' তাকিয়ে দেখলেন দাদুভাই খেলনা নিয়ে মেতে আছে।

'আমার সিগার কেসে কি করে তার হাতের ছাপ পড়ল শোন তবে সেই কাহিনী।' ব্রজবাবু একেবারে হাওড়া ষ্টেশন থেকেই শুরু করলেন। সুরপতি পাঠকের অস্বাভাবিক অচরণটা প্ল্যাটফর্ম থেকেই কৌতূহলকে টেনেছিল, কিন্তু পরে কম্পার্টমেণ্টের মধ্যে সে যা শুরু করে দিল তাতে চুপ করে বসে থাকা শক্ত। জ্যোতিষ তাঁর প্রিয়চর্চার

বিষয়। এই সাধনযোগ্য বিদ্যাটিকে যারা ছেলে খেলা করে নষ্ট করে দিতে চলেছে তাদের ওপর তাঁর প্রচ্ছন্ন ক্রোধ আছে। এদেশে এখন হোমিওপ্যাথির যে দশা হয়েছে, জ্যোতিষীর হাত দেখা আর ছক বিচারেরও সেই পরিণতি হতে চলেছে। তাই ছোকরাটাকে বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে হল। আর সেই মুহূর্তেই মনে হল এর সঙ্গে এর আগেই একবার কোথাও যেন বোঝাপড়া হয়েছিল। কোথায়, কেন এবং কিভাবে তা মনে পড়ল না। নাম মনে নেই, চেহারাও খুব সম্ভব কিছুটা পাল্টাপাল্টি হয়েছে। শুধু আউট লাইন, চাউনি, গলার স্বর আর ভঙ্গিটা যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে। নিজের হাত দেখানোর ছুতোয় এক ফাঁকে ওর হাতটাও এক ঝলক দেখে নিলেন ব্রজবাবু। হাতটা চমকাবার মতই। একটা পারফেক্ট খুনীর হাত। মূর্তিমান শয়তান যাকে বলে। মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কিন্তু হাতের রেখা সব বলে দিচ্ছে। কয়েক বছর আগে একটা বিপজ্জনক ফাঁড়া গেছে আবার সামনে একটা ঘূর্ণি দেখা দিয়েছে। এইবার বোধ হয় পার পাবে না, তলিয়ে যেতে হবে। ব্রজবাবু মনের ভাব বুঝতে দিলেন না। হাসি-ঠাট্টায় লঘু করণের মধ্যে দিয়ে কিছুটা আতাত জমালেন। চুরুট খাওয়ালেন। ঠিকানা বিনিময় করলেন কিন্তু তখনো জানেন না তিনি এসব কেন করেছেন। হয়তো এটাই সেই প্রফেশন্যাল উইকনেস, যার হাত থেকে মানুষ উদ্ধার পায় না।

এই পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু দুর্গাপুর ষ্টেশনে ছোট্ট একটা ঘটনায় তাঁর কেমন খটকা লেগে গেল। কুলি মালপত্র তুলে দিয়েছে, উনি ট্যাক্সির দরজা খুলে ভেতরে একটা পা বাড়িয়েছেন এমন সময় চোখে পড়ল জিনের প্যান্ট পরা সেই ফাজিল ছোকরা তাঁর পাশ দিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যেতেই পারে, দুর্গাপুরে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ নামবে না এমন তো কথা ছিল না। বহু প্যাসেঞ্জারই নেমেছে, বলতে গেলে গাড়ি প্রায় অর্ধেক খালি হয়ে গেছে দুর্গাপুরে। সকলেই দুর্গাপুরের মানুষ না, বেশ কিছু লোক বাঁকড়ো-বিষ্টুপুর-পুরল্যা কি রাঁচির দিকে যাবে। বাস-মিনি

এক্সপ্রেস-ট্যাক্সি-প্রাইভেট গাদা লাগিয়ে আছে। ট্রেন থেকে নেমেই লোকে পঙ্গপালের মত পিল পিল করে ছুটেছে। এ ছেলেটাও না হয় ছুটল। কিন্তু ঘটনা তা নয়, ছেলেটার হাতে সুরপতি পাঠকের ব্রীফকেসটা কেন? সুরপতি তো আসানসোলে নামবে!

হীরক বলল, 'বাবা ব্রীফকেসে কি মিঃ পাঠকের নাম লেখা ছিল? নাকি সেটা আনইউজাল ধরনের বা রংয়ের ছিল?

ব্রজবাবু মাথা নাড়লেন, 'না। আনকমন কিছু না। মাঝারি দামের, কালো ফোমরেক্সিন মোড়া যেমন হয়। নতুন এই পর্যন্ত।'

হীরক বলল, 'তা হলে? ওরকম ব্রীফকেস তো বাটার জুতোর মত শয়ে শয়ে রাস্তা পেরোয়।'

ব্রজবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'কিন্তু ওর পিঠের ওপর যে আমার অজ্ঞাতসারেই অটোরাইটিং হয়ে গিয়েছিল। সুরপতি যখন প্ল্যাটফর্মে ছুটন্ত অবস্থায় জানলা গলিয়ে ওটা আমাকে গস্ত করে দেয় তখন আমার হাতে চুরুট ছিল। তার গরম ছাই ঘষা খেয়ে প্যাস্টেলে আঁকা একটা টিক্ চিহ্নের মত দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমিও প্রথমটায় ধরতে পারিনি কিসের দাগ ওটা, কিছু পরেই চুরুটের নিবে যাওয়া থ্যাঁতলানো মাথাটা নজরে পড়তে লজ্জিত হয়েছিলাম মনে মনে। কিন্তু মুছে দেবার চেষ্টা করে নিজের কৃতকর্ম আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চাইনি।'

'ফ্যানটাসটিক ডায়োগনসিস!' হীরক ইমোশন্যাল গলায় বলল, 'আপনার সত্যিকারের দেখার চোখ আছে। একেই বোধ হয় এক্সরে আই বলে।'

ব্রজবাবু তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললেন, 'না। কমনসেন্স বলে।'

ব্রজবাবু ভেবেছিলেন দুর্গাপুরে মেয়ের বাড়িতে কটা দিন হাওয়া বদল করে যাবেন। এর আগে ভূপালে যেমন একটি মাস বড় মেয়ে তপতীর কাছে কাটিয়ে এসেছিলেন স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে। হাওয়া

বদল শুধু কি আর জলমাটি আর আবহাওয়ার বদল, তা নয়। একে বলতে হয় ঘর বদল। প্রতিদিনের অভ্যাস থেকে নিরবচ্ছিন্ন ছুটি নেওয়া। জলের টানকে কাজে লাগিযে সাঁতারু যেমন চিৎ সাঁতারে ভর বদল করেন তেমনি ভাবে ব্রজবাবু নতুন জলের টানে নিজেকে ছেড়ে দেবেন, হাতে পায়ে কোন কাজ থাকবে না, রুটিন ওয়ার্ক বন্ধ।

কিন্তু হল না। ঈষৎ গুরুভোজনের পর অচেনা বিছানায় দুপুরের দুর্লভ ঘুমের পায়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে একখানা ইংরেজী পেপার ব্যাক থ্রিলারের অতি উত্তেজক পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ অস্বাচ্ছন্দ বোধ করলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন শারীরিক কোন অসুবিধে হচ্ছে যা তাঁর কাছে নতুন, যা তিনি ধরতে পারছেন না। এই বৃদ্ধ বয়সের নতুন কোন উপসর্গ। মেটাবলিক ক্যালকুলেশনে কিংবা সার্কুলেটরী সিসটেমে হয়তো কোন ম্যাথামেটিক্যাল এরর—অতি সূক্ষ্ম, অতি সামান্য—ঘটে গেছে যার ফলে এই অস্বস্তি।

একটু পরেই বুঝতে পারলেন, এটা নতুন কিছু নয়, এটা তাঁর সেই পুরনো রোগেরই উপসর্গ, এতদিন পরে আবার রক্তের মধ্যে ফিরে এসেছে। যার তাড়নায় একদিন ঘর-সংসার, নাওয়া-খাওয়া ভুলে বুনো হাঁসের পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কত রাত বিছানায় নিদ্রাহীন শুয়ে শুয়ে ছটফট করেছেন শুধু একটা পিছলে যাওয়াঅঙ্ক মেলাতে পারছেন না বলে।

আজও সুরপতি পাঠক তার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ খচ্‌খচ্ করে যাচ্ছে। কিছুতেই লোকটাকে লোকেট করতে পারছেন না। আইডেন্টিফাই করতে পারছেন না। শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে, লোকটা কখনো কোন ব্যাপারে তাকে ট্রাবল দিয়েছিল, খুব ঘুরিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তার হাত পিছলে পালিয়েছিল। এরকম ঘটনা একটা নয়। তাঁর পঁয়ত্রিশ বছরের চাকুরিজীবনে অজস্র ঘটেছে। বিশেষ করে প্রথম জীবনে অনভিজ্ঞতার ফলে সামান্য ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে এইভাবে। শিকার ফসকে যাওয়ার চেয়ে বড় দুঃখ শিকারীর জীবনে আর কি থাকতে পারে।

অবিশ্যি নিজেকে তিনি কোন বড় শিকারী মনে করেন না। পুলিস লাইনে বেশীর ভাগই তো কমন রানের মানুষ। সফিষ্টিকেটেড ট্রেনিংয়ের সঙ্গে সামান্য কিছুটা ট্যালেন্ট, অনেষ্টি, ইগারনেস আর গিফটেড ইনটুইশন যোগ হলেই গোয়েন্দা অনেকদূর এগিয়ে যায়। তিনি এপথে বেশীদূর যে এগোতে পেরেছিলেন তা নয়। শুধু স্বাস্থ্য সাহস আর জেদ যতখানি নিয়ে যেতে পারে ততটুকুই। তাই নিজেকে সুপারম্যান কোনদিনই ভাবেন নি। শার্লক হোমস কি অরকিউ লায়রোর মত সত্যসন্ধি শুধু গল্পের পৃষ্ঠায়ই জন্ম নেয়, জীবন অন্য রকম। বিশেষ করে এই পরাধীনোত্তর উপস্বাধীন দেশে সরকারী চাকুরে গোয়েন্দা পুলিশের জীবনে পদে পদে বাধা, হাত পা বাঁধা অক্ষমতা আর অসহযোগিতা, অসাচ্ছল্যের মধ্যে কাজ করতে হয়। পলিটিক্যাল প্রেশার হাত থেকে রিপোর্ট কেড়ে নেয়, প্রমাণ টমান, এগজিবিট ক্লু চেপে রাখে। বজ্র আঁটুনি শেষ পর্যন্ত ফসকা গেরোয় বেইজ্জত হয়। সব মিলিয়ে গোটা ব্যাপারটাই থ্যাংকলেস জব। জনসাধারণ এবং উপরওয়ালা দু তরফেই। তবু এর ভেতর দিয়েই সামান্য কেরাণী থেকে অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার হয়েছিলেন। যথেষ্টই হয়তো। বুকের মধ্যে বিরুদ্ধ আগুন নিয়ে মানুষ আর কত উঁচুতে উঠবে?

থ্রিলারটা হাত থেকে খসে পড়ল বালিশের পাশে। ব্রজবাবু দু হাতে মুঠো করে নিজের চোখ ধরে নাড়া দিতে লাগলেন। মগজটা ঝাঁকি খেয়ে যদি জেগে ওঠে একবার। সব সহ্য হয় কিন্তু স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতা যেন সহ্য হয় না। এ যেন নিজের কাছে নিজে প্রতারিত হওয়া। এই বয়সেই স্মৃতিভ্রংশ হলে কেমন লাগে? অর্জুন যেদিন তাঁর সব চেয়ে বিশ্বস্ত আয়ুধ গাণ্ডীব তুলতে পারেননি সেদিনও বোধ হয় এইরকমই চোখে জল এসে গিয়েছিল। চুলের গোড়ায় যেন ছুঁচ বিঁধছে, নির্মম হাতের মুঠো নির্মমতর হচ্ছে, যন্ত্রণায় চোখে জল এসে গেছে প্রাক্তন বি. এস. সি ব্রজসুন্দর বাবুর চোখে!

কেস মনে আসছে না, কিন্তু রেজাল্টটা মনে পড়ছে—এ কিরকম

স্মৃতি? ব্রজবাবু চুল ছেড়ে দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলেন। তারপর ক্রুদ্ধ আহত পশুর মত আধা গর্জন অথবা আধা গোঙানী মিশিয়ে নিজেকে বললেন, কি মিঃ চন্দ্র, তোমার বয়সই আজ তোমাকে অর্ধচন্দ্র দিচ্ছে বুঝতে পেরেছ কি?

নাঃ এ হয় না, হতে পারে না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুও এর থেকে ভালো। উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন ব্রজবাবু। তারপর কেমন আচ্ছন্নের মত জামাকাপড় পড়ে বাইরে বেরোনোর জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। তাঁর মনের মধ্যে তখন শুধু দুটো শব্দ দুয়ো দেওয়ার ভঙ্গিতে তালি বাজিয়ে চলেছে: আপকার গার্ডেনস! আপকার গার্ডেনস, আসানসোল!

সুতপা প্রাক্ বিকেলের চা নিয়ে ঘরে ঢুকে চমকে গেল। বাবা জামা কাপড় জুতো পরে সোফায় বসে চুরুট ধরিয়েছেন।

আসানসোলের গাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে কাকতালীয় যোগাযোগটি ঘটে গেল। সুতপা খবর আনলো পাশের বাংলোয় এক ডাক্তারবাবু এসেছেন আসানসোল থেকে, তিনি এক্ষুনি ফিরবেন। তিনি। তিনি নিজে থেকেই ব্রজবাবুকে লিফট দিতে চেয়েছেন।। আপকার গার্ডেনস তাঁর বাড়ির কাছেই। ব্রজবাবু খুশী হলেন। প্রথমবার যাওয়াটাই আসল, চেনা লোক সঙ্গে থাকলে পাড়াটা খুঁজতে হবে না। তার পর ফেরা, সেটা কিছু না, ট্রেন বাস শেয়ারের ট্যাকসি একটা না একটা ঠিক জুটে যাবে।

সচরাচর ডাক্তাররা একটু রসিক মানুষই হয়ে থাকেন। ডাঃ জানা রসিক এবং সজ্জন। সাহিত্যপ্রেমী এবং থ্রিলারের পোকা। সুতরাং গোয়েন্দা সাহিত্য নিয়ে আলাপ জমে উঠতে বিলম্ব হল না। বিশেষ করে ব্রজবাবু প্রাক্তন পুলিস অফিসার জানার পরে আরো। রিটায়ার করার পর বাড়িতে বসে আছেন শুনে ডঃ জানা বললেন, 'সে কি মশাই, আপনি তো এখনো ষ্টিল গোইং ষ্ট্রং আছেন। এই স্বাস্থ্য এই অভিজ্ঞতা কজন বাঙালীর থাকে? এই অ্যাসেট আপনি টবের

গাছ খুঁচিয়ে নষ্ট করবেন না। আমার একটা আইডিয়া ছিল'—বলে কথাটা লাজুক হাসি দিয়ে অসম্পূর্ণ রেখে গেলেন।

ব্রজবাবু ডঃ জানার নিপুণ হাতে গাড়ি চালানো দেখছিলেন। গল্প করতে করতে অনায়াসে মুখোমুখি এসে পড়া ট্রাফিক ট্রাবল এড়িয়ে যাচ্ছেন নির্ভুল স্পেকুলেশনে, ষ্টিয়ারিং হুইলের মসৃণ মোচড়ে। গিয়ার রেগুলেট করতে, অ্যাকসিলারেটারে চাপের তারতম্য ঘটাতে তাঁর রিফ্লেকস অ্যাকশন যেন সপ্রতিভ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

মৃদু হেসে বললেন, 'বলতে বাধা না থাকলে আইডিয়াটা শুনেই রাখি।'

'হাসবেন না কিন্তু মাই ডিয়ার স্যার।' ডঃ জানা মজার মুখভঙ্গি করে বললেন, 'এটা যেন মনে না হয় গল্পের বই পড়ে পড়ে কোন ইম্যাচিওর টিনএজার স্বপ্ন আমার মধ্যে গ্রো করেছে। আমি বেশ কিছুকাল থেকেই ভাবছি আপনাদের মত একস সার্ভিস-ম্যানরা কেন একসঙ্গে হয়ে কোন প্রাইভেট ইনভেষ্টিগেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন না! অভিজ্ঞ পাকা মাথা এক সঙ্গে হলে অনেক অসাধ্য সাধনই করা সম্ভব। চাকরির প্যাঁচ পয়জার বাধ্য বাধকতা নেই, সমস্ত ট্যাকসেশন ফ্রী হয়ে কাজ করে যাবেন। বিশেষ করে দেশের এই অবস্থায় যখন অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে!'

ব্রজবাবু বললেন, 'হাসব কেন? এরকম একটা দুটো প্রতিষ্ঠান তো আছেই শুনেছি।'

'আমিও শুনেছি। কিন্তু তাঁরা আসল কাজে বড় কাজে নিজে থেকে হাত দিচ্ছেন কই। এ তো ডাক্তারের কেরাণীগিরি করার মত। ছুরি কাঁচি ছুঁচ ফেলে শুধু ফিট আর আনফিট সার্টিফিকেট লিখে যাওয়ার মধ্যে আর কৃতিত্ব কি মশাই? আমার বৌয়ের চরিত্তির ভালো না মন্দ, আমার মেয়ে কার সঙ্গে পালিয়েছে কি আমার ছেলে রেস খেলতে শুরু করেছে কিনা জানার জন্যে আপনাকে কল দিতে চাই না। টেলিফোনে আড়ি পাতার কি লটারির কোটি টাকা পাবার পর বডিগার্ড হবার জন্যে মাথামোটা লোক অনেক আছে,

আপনি কেন ? আরো অনেক বড়ো অনেক গভীর অপরাধের বিষাক্ত শিকড় উপড়ে ফেলার কাজে আপনি ডেডিকেটেড হবেন। দেশ ও দশের স্বার্থ যেখানে বিপন্ন সেইখানে আপনার এলেম বোঝা যাবে! এর জন্যে অনেক রকম মাথা এক সঙ্গে হতে হবে। আপনার দলে ডক থাকবে ডিক থাকবে সিক থাকবে—মিনিমাম এই তিন স্পেশ্যালিষ্ট মাথা।'

ব্রজবাবু সাহাস্যে বললেন, 'খুব নোবল, খুব গ্লোরিফায়েড আইডিয়া! আমি হ্যারি-ডিক-টম বলে একটা কথা শুনেছি, কিন্তু আপনার ওই ডক ডিক-সিক বস্তুগুলোন কি ?'

'ডকটর, ডিটেকটিভ আর ফরেনসিকের সিক—' জানা হাঃ হাঃ করে হাসলেন, 'তা যদি সত্যিই এরকম কোন ভেঞ্চার করেন তো আমার কথাটাও মনে রাখবেন মিঃ চন্দ্র। ইউ শুড লেট মি হ্যাভ এ চান্স!'

'ওঃ শিওর ডক ড্রাই!' ব্রজবাবু আর এক পর্দা চড়িয়ে হাসলেন।

'এ বস্তুটাই বা কা ?'

'ডক্টর অ্যাণ্ড ড্রাইভার, এফ থ্রি—ফ্রেণ্ড-ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইডের মত!'

সহাস্যে ডঃ জানা বললেন, 'তাহলে এইখানেই আমাদের ইতি। এই আপনার আপকার গার্ডেনস! এবার নম্বর খুঁজুন, যাবেন কোথায় ?'

'তা হলে বুক ভরা ধন্যবাদ রইল, এবার চলি। গুডবাই ডক্টর! টয়-ট্র্যাফিক আমি খুঁজে নিতে পারব, নম্বরটাও জানি।'

'টয়-ট্র্যাফিক ? আরে সেটাতো একটা কারখানা। এখান থেকে অনেকটা হাঁটতে হবে আপনাকে। চলুন একেবারে কারখানার দরজায় নামিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। আরে, আপনি··· আপনি যে একজন ওয়াণ্ডারফুল দাদু, সেই কথাটাই গল্পে গল্পে ভুলে গিয়েছিলাম। তা নাতির জন্যের নতুন মডেলের খেলনা চাই বুঝি? অর্ডার দিতে যাচ্ছেন, না দেওয়াই আছে ?'

—খেলনা চাই আমার নিজের, নাতির জন্যে না। রি মডেল

করা নতুন খেলনাই অবশ্য সেটা। কিন্তু কথাটা মনে মনেই মনেই বললেন ব্রজবাবু, মুখে কোন শব্দ হল না। কেবল নন-কমিট্যাল ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে।

টয় ট্র্যাফিক-এর কারখানাটা মোটেই খেলনা মার্কা নয়। মস্ত পাঁচিল ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছবির মত সাজানো বাগান, কৃত্রিম জলাধার-ফোয়ারা দিয়ে ঘেরা দোতলা বাড়িটা দেখে ব্রজবাবু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সুরপতিকে নেহাত চালিয়াৎ চন্দর ভেবেছিলেন, কিন্তু সে যে এতটা পয়সা কড়ি করেছে, এরকম প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে ভাবতে পারেন নি। বাড়িটার সামনের অংশে দোকান দুটি বিশাল শো উইণ্ডো জুড়ে দেশ বিদেশের পুতুলের রেপ্লিকা সাজানো। সুদৃশ্য ঝকঝকে ফরমাইকা মোড়া অর্দ্ধবৃত্তাকার কাউণ্টারটা খেলনা রানওয়ের মত হল ঘরখানাকে ঘিরে রেখেছে। কাউণ্টারের পিছনে সারি সারি চেয়ার। এ পাশে ক্যাশের আলাদা এনক্লোজার।

বাড়ির পিছনের অংশটা কারখানা। দেশ বিদেশের পুতুল সংগ্রহ করে এনে রিপ্রোডাকশন করার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর ডিজাইনার আর্কিটেকটরা নতুন নতুন নকশা আর কাঠামো তৈরী করে। দোতলায় গোডাউন আর রেসিডেন্স। সুরপতি পাঠক দোতলায় তার নিজের কোয়ার্টারে ব্রজবাবুকে রিসিভ করল, 'আসুন মিঃ চন্দ্র, আসুন! জানতাম আপনি আসবেন। তবে এত তাড়াতাড়ি ভাবিনি।'

আলিগড়ী চুস্ত আর লাখ্‌নি কাজ করা পাঞ্জাবি পরে সুরপতিকে অন্যরকম লাগছিল। অন্যরকম মানে আপকান্ট্রির মুসলমান মনে হচ্ছিল। আর একটা কারণ বোধহয় চোখে ষ্টীল ফ্রেমের পাতলা স্বচ্ছ চশমা ছিল, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি অবশ্যই, কিন্তু রংচশমা না থাকায় মুখখানাকে অনেক বেশী অনাবৃত মনে হচ্ছিল। না-বয়স হয়েছে, চল্লিশের সঙ্গে আরও দশ যোগ করলেন।

'কেন?' ব্রজবাবু ঘরের চারপাশ দেখতে দেখতে বললেন, 'আমি

যে আসবোই একথা আপনি কি করে ভেবেছিলেন? ট্রেনের আলাপ তো অনেক সময়ই ওই ঠিকানা লেনদেনেই কেটে যায়।'

'তা যায়। আবার যায়ও না।' সুরপতি চিন্তিত চোখে এক মুহূর্ত ওঁর দিকে চেয়ে থেকে ফের বলল, 'আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম আপনি কথার মানুষ। এবং আমাকে আপনি না-পছন্দ করেন নি, ইনফ্যাক্ট আমাকে আপনি সিলেকট করেই ফেলেছেন।'

শব্দটা ফট করে কানে লাগল বি. এস. সি. ব্রজসুন্দরের। হুক ঝাড়লো নাকি ছোকরা? ছোকরা কথাটা ওঁর মুখের নয় মনের মুদ্রাদোষ, কিশোর বৃদ্ধ নির্বিশেষে, প্রয়োগ করে থাকেন। মানে ভাবেন, ছোকরা বিশ্লেষণে ভাবেন।

ঠোঁটে হাসির ফুসকরি ফুটিয়ে সুধোলেন, 'সিলেকট মীনস?'

সুরপতি এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়ে বলল, 'মানে ইয়ে, মানে পছন্দ। কেন ইংরাজী কি কিছু ভুল বললাম? ইয়ে মিঃ চন্দ্র অপরাধ নেবেন না, বসতে বলতে ভুলেই গেছি।'

'না ভুল আর কোথায়!' ব্রজবাবু মাথা দোলালেন, কিন্তু মনের মধ্যে একটা খিঁচ থেকেই গেল, দূর হল না।

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন 'নো ফর্মালিটি প্লিজ।'

'কফি বলি। আরাম করুন, এই 'নিন,' সুরপতি পকেট থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট আর লাইটার বের করে ওঁর হাতের কাছে রাখলে।

'আপনি ধরান, আমার চুরুট আছে,' ব্রজবাবু পকেট থেকে চুরুট ভর্তি সাদা খাম বের করলেন।

'সেই বর্মী চুরুট?'

'চলবে?'

'চলবে কি বলছেন, মুখে লেগে রয়েছে। স্যরি, সকালে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি আপনাকে···চুরুট সম্পর্কে আমার ধারণাই পাল্টে গেছে! স্ট্রেঞ্জ!'

'কেন স্ট্রেঞ্জ কেন?'

'এতক্ষণ খেয়ালই করিনি, আপনার সেই সিগারকেসটা কোথায় ?'

চুরুট থামে ভরবার সময়েই ব্যাখ্যাটা ভেবে রেখেছিলেন ব্রজবাবু। মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'আর বলেন কেন, ছেনতাই হয়ে গেছে।'

'অ্যাঁ! বলেন কি সকাল বেলায় দুর্গাপুরের মত জায়গায় ?' সুরপতির চোখে সন্দেহ, 'ভাবতেই পারছি না দুর্গাপুরের মত জায়গায় ...এযে দিনে ডাকাতি মশাই।'

'দিনে ডাকাতিই তো, দিনে দুপুরে ডাকাতি।' ব্রজবাবু হাসলেন, 'অনেকক্ষণ লড়েছিলাম কিন্তু পারলাম না! এই বয়সে কি আর ইয়ংম্যানের সঙ্গে পারি ?'

'ইস অমন সুন্দর জিনিসটা, আমারই লোভ হয়েছিল। আসলে গোল্ড বলে ভুল করেছে।'

'হ্যাঁ তাই মনে হয়।' গম্ভীর মুখ করে বললেন, 'যাকগে নিকগে, নাতিই তো।'

সুরপতির চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল, বলল, 'অ্যাঁ। আপনি মশাই ডেঞ্জারাস রসিক তো! আপনার নাতি, আই মীন মেয়ের তরফের নাতি, আই মীন মেয়ের ছেলে? কত বয়স? ওঃ মজার লোক!'

কফি, এসে গিয়েছিল। দুজনের জন্যেই।

'নিন স্যার, কফির পরে চুরুট হবে। চিনি আপকা মর্জি' সুগার পট দেখিয়ে হাতে চামচ তুলে দিল।

'সুগার কোন প্রবলেম নয়,' ব্রজবাবু মজার ভঙ্গি করে বললেন, 'আমি নিজেই একটি আস্ত সুগারকোটেড কুইনাইন।'

'হুঁ ঠিকই ধরেছিলাম।'

ব্রজবাবু সামান্য চমকালেন। 'কি ?'

'রসিক।'

তারপর কফি আর চুরুট সহযোগে আলাপ জমে গেল। আর যত আলাপ জমে উঠছিল ব্রজবাবু ততই হতাশ হচ্ছিলেন।

সুরপতির মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই পাচ্ছিলেন না। যেন হিসেবের খাতা আগাগোড়া পরিষ্কার, কোথাও কোন কারচুপির গন্ধ নেই। নর্মাল। তবে কি তাঁরই ভুল হল? এতটা পথ মিছিমিছিই ছুটে এলেন। যে জন্যে এসেছিলেন তা হল না, উল্টে সেই ভীষণ চেনা চেনা লাগার বোধটা যেন অনেকটাই ভোঁতা হয়ে গেল। বেশী কথায়, বেশী মজা তামাশায় হয়তো এরকম হয়।

কিন্তু এসেছিলেন তো মিসিং লিংক খুঁজতে। ডেলি লাইফে এই পিক আপ প্রসেসটা খুব কাজে লেগেছে অনেক সময়ই। হয়তো এঘর থেকে হঠাৎ কোন কথা মনে পড়ায় বলতে গিয়েছেন ওঘরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে অন্য কথায় অন্য পরিবেশে আসল কথাটা এমন ভুলে গেলেন যে শত চেষ্টা করেও আর মনে আনতে পারলেন না। মগজকে টচার করেও না। তখন নিরুপায় হয়ে ছেলেবেলায় ঠাকুমার শেখানো রীতিটা প্রয়োগ করেছেন। ঠাকুমা বলতেন, যা ও ঘরের বাতাস শুঁকে আয়। দেখিস ঠিক মনে পড়বে! আর ঠিক মনে পড়েছেও, আশ্চর্য। যেখানে প্রথম তাঁর কথাটা মাথায় এসেছিল সেখানে পৌঁছাতে হবে। তারপর যেখানে যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেই ভাবে ফিরে আসতে হবে। এনভায়রনমেণ্ট-এর এক ধরনের ফিজিকাল মেমরি আছে। দৃশ্যে শব্দে গন্ধে তার পুনরুত্থান হয় আজও। ব্রজবাবু অনেকটা সেই কারণেই তাড়াহুড়ো করে এসে ছিলেন! এই সুরপতির চারপাশের বাতাসটা একবার শুঁকে যেতে পারলে হয়তো মেমারি ক্লিক করতে পারে। হারানো অতীতের ভেতর থেকে মিসিং লিংকটা আবার ফিরে আসতে পারে! কিন্তু এলো না, কই আর এলো।

এবার ফিরতে হয়, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে দুর্গাপুরে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। ব্রজবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'মিসেসকে একবার ডাকুন, আলাপ করে না গেলে অভদ্রতা হবে।'

সুরপতি হাসলো, 'আঁতে ঘা দিলেন মিঃ চন্দ্র, ওই একটা ব্যাপার আমি খুব মিস করেছি। আই ওয়াজ বর্ন ব্যাচেলার, ব্রট আপ

ব্যাচেলার অ্যাণ্ড আই উইল ডাই ব্যাচেলার। এই ফ্ল্যাটে কোন স্ত্রীভূমিকা নেই।'

'সেকি। কিন্তু আপনার'—ব্রজবাবু থেমে গেলেন! সকালে ট্রেনের মধ্যে এবং এখন এখানে অসাবধান মুহূর্তে সুরপতির হাত মোটামুটি পড়ে ফেলেছেন তিনি। তাঁর দেখায় যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে সুরপতি একাধিক বিবাহের সূত্র আছে। এবং বোধ হয় নিঃসন্তানও নয়। কিন্তু সুরপতি অম্লান বদনে অস্বীকার করল। মিথ্যে বলল।

'বুঝেছি!' সুরপতি খোলা গলায় হাসল, 'আপনি শূর‍্যাকে লেডিস শ্লিপার দেখে ফেলেছেন। ও জুতো আমাদের এই ফার্মের কর্ত্রীর। মিসেস রায়চৌধুরীর। এক-আধবেলার জন্যে যখন কারখানা ইন্সপেকশনে আসেন, তখন এই ঘরটা ওঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তবে সে নমাসে ছমাসে ঘটে। কারণ ভদ্রমহিলা বেশীর ভাগ সময়েই বাইরে ঘুরে বেড়ান, দেশে কমই থাকেন।'

কথাটা না তুললে ভেতরের ব্যাপার না জানাই থেকে যেত। এই ফার্মের মালিকানা সুরপতির নয়। সে এই কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার। তবে শেয়ার আছে তারও। ব্যবসার যাবতীয় কিছু সেই দেখা শোনা করে। ভদ্রমহিলা এক মালটিমিলিওনীয়ারের বিধবা স্ত্রী। শখ করে এই পুতুলের ব্যবসা খুলেছেন। আর্ট এবং কালচার খুব ভালবাসেন। ওঁর বিশ্বাস শিশুদের হাত দিয়েই সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক সেতু-বন্ধন ঘটবে। 'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।' রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনটা আপনা থেকেই মনে পড়ে গেল ব্রজবাবুর।

যাবার আগে সুরপতি ব্রজসুন্দরবাবুকে কারখানায় নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে দিল। ব্রজবাবু ভদ্রতাবশতই না করতে পারলেন না নইলে পুতুল তৈরীর কায়দাকানুন নিয়ে তাঁর মোটেই মাথা ব্যাথা ছিল না। তবে হ্যাঁ ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টটা দেখবার মত। মোম দিয়ে তৈরি সুন্দর সুন্দর সব পুতুল আর মূর্তি কত অল্প সময়ে

ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসছে। রঙ মেশানোর কায়দাটাও অপূর্ব। পাশাপাশি একাধিক রংকে কী আশ্চর্য উপায়ে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাঁচ আর পেপার পাল্পের কাজ হচ্ছিল না বলে দেখা হল না। বেরুবার মুখে থমকে দাঁড়ালেন। ভেবেছিলেন মুখোশ। না মুখোশ না, ঘুড়ি। টিবেটান, চাইনীজ আর জাপানী ঘুড়ির পাশে আমাদের দেশের ইদানীং লোপ পেয়ে যাওয়া বিচিত্র আকৃতির ঘুড়িও আছে।

'বাবা। কিছুই বাদ নেই দেখছি।' ব্রজবাবু বললেন, 'আপনাদের কারবার দেখে আবার শিশু হয়ে জন্মাতে ইচ্ছে করছে।'

সুরপতি হাসল, 'বলা যায় না স্যার, সত্যিই আর একবার নতুন করে জন্মাতে হতে পারে। এত সহজে কি সব পাওয়া যায়।'

কথাটা আবার কেমন খচ করে বিঁধল।

গাড়ি করে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবার সময় সুরপতি বেশ বড় সড়ো একটা প্যাকেট ব্রজবাবুর হাতে ধরিয়ে বলল, 'আপনার থার্ড জেনারেশন ছিনতাই সম্রাটের জন্য সামান্য কিছু ঘুষ দিলাম।'

বিব্রত ব্রজবাবু বাধা দেবার চেষ্টা করে বললেন, 'আরে একি, নানা এসব নিতে পারব না।'

'আপনি নেবেন না, আপনি দেবেন।'

'জানেন জীবনে আমি কাউকে ঘুষ দিইনি।' রঙ্গ করেই বলেছিলেন কথাটা।

সুরপতি পাল্টা রসিকতা করল, 'এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। আই মান, সে ঢালও নেই, সে তরোয়ালও নেই—রিটায়ার করেছেন এই কথাটা মনে রাখবেন।'

ব্রজবাবু বিষণ্ণ ভাবে মাথা দোলালেন, 'হ্যাঁ, আছে শুধু এই নিধিরাম সর্দার।'

'নিধিরামবাবুর সিগারকেস ঠিক উদ্ধার হয়ে যাবে দেখবেন। ঘুষের চেয়ে বড় কারেন্সি এখন আর বাজারে নেই।'

ট্রেনে উঠে ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়তে পড়তে ব্রজবাবু

ভাবলেন, কথাও শিখেছে লোকটা। এ বোধ হয় কথা দিয়েও চিঁড়ে ভেজাতে পারবে। কিন্তু লোকটার রসিকতা একটু কেমন যেন। হয়তো খুব ইনোসেন্ট নয়। থেকে থেকে নখের ঝিলিক বেরিয়ে পড়ে।

ট্রেন ছেড়ে দিল কিন্তু সুরপতি ছাড়ল না। জানলার বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে একটানা উঁকি মেরে চলল। তার চেহারা, তার কথা, তার ব্যবহার। তার চুল পরিমাণ ভাব বদল, রসিকতা, ব্যবসাবুদ্ধি। তার হাতের রেখার সঙ্গে মুখের জবান, ঢাল তরোয়ালের উল্লেখটা খুব সাজেসটিভ। নিজের প্রফেশন তিনি ওর কাছে তো ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নি। কিন্তু সত্যিই সে কথাটা গোপন আছে কি? সুরপতিকে তিনি চিনতে পারেন নি কিন্তু সুরপতি তাঁকে হয়তো ঠিকই চিনেছে। হয়তো সেই প্রথম দর্শনেই।

নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ব্রজবাবু ভুরু কুঁচকে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন। পাতলা জ্যালজেলে মেঘে কখন আকাশ ছেয়ে গেছে খেয়াল করেন নি। হঠাৎ মেঘের তলা থেকে কাজল ধ্যাবড়ানো চাঁদ বেরিয়ে আসতেই নজরে পড়ল। মনে হল, কারখানায় দেখে আসা চীনে ড্রাগন ঘুড়িটা সটান উড়ে আসছে। আর তক্ষুনি একটা কাণ্ড হল, সাংঘাতিক কাণ্ড। ঠাকুমার দেওয়া সেই সেকেলে চাবির মোচড় লেগে যেন অনেকগুলো জংধরা দরজা পটাপট খুলে গেল!

অপরিসীম বিস্ময়ে অভিভূত ব্রজবাবু অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকলেন। আনন্দে তিনি যেন বোবা হয়ে গেলেন। নম্বরী তাসখানা এতক্ষণ তাঁর নিজের হাতের মধ্যেই লুকোনো ছিল, অথচ তিনি নিজেই জানতেন না। ব্রজবাবু ট্রেনের আওয়াজে গলা ছুপিয়ে হঠাৎ আবৃত্তি করে উঠলেন—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম।

কে জানে বাবা ভুল হল কিনা। যতই বলো, মেঝারি এখন

আর শার্প নেই, বয়স খেয়ে দিয়েছে। আজ বিশ্বকর্মা পূজোর পরদিন, দিন নয় অবশ্য রাত। তা হোক সেটাও বিশ্বকর্মা পূজোর পরের রাতই ছিল যখন লোকটা গোসাবার হেলথ সেন্টারে মারা গিয়েছিল। অবিশ্যি বড় হাসপাতালে, যথা জায়গায় পৌঁছালেও কোনো ওষুধ, কোন ডাক্তার তাকে আর বাঁচাতে পারত না। কারণ তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। টিটেনাসের অমন অ্যাকিউট অ্যাটাক এমনিতেই বেশী সময় দেয় না। তার ওপর রোগটী শেষ মুহূর্তের আগে ধরতে পারা যায়নি, ওষুধ পড়েছিল অবশ্য, নিজস্ব বিধানে গোটা কতক পেনকিলার গোছের মামুলি ট্যাবলেট।

ঘটনাচক্রে তিনি সেদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোসাবাতেই হাজির ছিলেন। খুব সম্ভব সরেজমিনে কোন একটা মার্ডার কেস খতিয়ে দেখতে থানার অতিথি হয়েছিলেন। ওই মৃত্যুর খবরটা তখনই আসে।

সুন্দরবন বিহার করতে এসেছিল একটি লঞ্চ। কয়েকজন তরুণ তরুণী মিলে, যাকে বলে প্রমোদ ভ্রমণ। কিন্তু তাদের একজন, ওই প্রাইভেট লঞ্চটার মালিক হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওরা বনের ভেতর থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, উর্ধ্বশ্বাসে লঞ্চ চালিয়ে গোসাবায় পৌঁছায়। রোগটা সেখানেই ধরা পড়ে। অ্যান্টিটিটেনাস ইঞ্জেকশানও দেওয়া হয় কিন্তু ফল হয় না।

কেসটা ইন্টারেষ্টিং। কারণ ব্রজবাবুর পরামর্শে পুলিস এটাকে ন্যাচারাল ডেথ হিসেবে ট্রিট না করে মার্ডার কেস হিসেবেই ট্রিট করেছিল। মৃতের বন্ধু এবং ওই বনবিহারে সঙ্গী যুবকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনও করা হয়েছিল কিন্তু আদালতে বেকসুর খালাস পেয়ে যায় আসামী। ব্রজবাবু কিন্তু সেদিন এই আদালতের রায় মনে মনে মেনে নিতে পারেন নি। অনেক দিন পর্যন্ত পরাজয়ের ক্ষতটা মনের মধ্যে বহন করে ফিরেছিলেন তিনি। তারপরে কালের নিয়মে ভুলেও গিয়েছিলেন। তা কম দিনের তো কথা নয়, বিশ বাইশ বছর হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। নাম টামগুলো আর মনে পড়ে না, মুখও অতি

ঝাপসা. কিন্তু ঘটনাটা এখন এই মুহূর্তে খুঁটিনাটি সমেত স্পষ্ট। নামগুলো এতদিন বাদে মনে পড়ছে না, এতদিন বাদে মনে পড়ার কথাও নয়, আপাতত বানিয়ে নিতে দোষ নেই।

ধরা যাক বিমল বোস। কলকাতার এক বনেদী ধনী পরিবারের ছেলে, বছর দুই হল বিয়ে হয়েছে। সুন্দরী স্ত্রী এবং অপর্যাপ্ত অর্থ থাকলে যেমন হয়, কিছু অনুরাগী বন্ধুর একটা অন্তরঙ্গ চক্র তৈরি হয়ে যায়। বন্ধু বিশেষ করে যেখানে রক্ষণশীল নয়, আধুনিক, দু চারবার বিদেশ ঘুরে এসে পরিবারের পর্দা প্রথাকে সে ছিঁড়ে খুঁড়ে গুটিয়ে দিয়েছে। বউয়ের চুলে তখনই কাঁচি পড়ে গেছে, খানদানী আপ্যায়নে বাড়িতে স্কচ চালু হয়েছে। এক লরেটোর মেমসাহেব দিদিমণি এসে বউ বনানীকে স্পোকেন ইংলিশে তালিম দিচ্ছে।

বিমলের এক বাল্যবন্ধু খগেনের সম্প্রতি এ বাড়িতে অবাধ যাতায়াত। ছেলেটি গুণী, কিন্তু অবস্থা ভাল নয়। দেনার দায়ে পৈতৃক বাড়ি নিলাম হয়ে যাবার পর ওরা ভাগলপুর না পাটনার দিকে চলে গিয়েছিল। বি. এস. সিতে চমকে দেওয়া রেজাল্ট করেও আর পড়াশোনা করতে পারেনি। একটা বৃহৎ সংসারের দায় তখন তার ঘাড়ে, বাবার মস্তিষ্ক বিকৃতির সঙ্গে মাও অসুস্থ হয়ে পড়ে, গোটাকতক অপগণ্ড ভাই বোন নিয়ে প্রায় পথে দাঁড়ানোর অবস্থা। যাই হোক সে স্বতন্ত্র গল্প। অনেক ঘাটের জল খেয়ে বছর দশেক পরে সে ঝাড়া হাত পায়ে কলকাতায় ফিরে এসেছে ফাইজার না কোন এক ওষুধ কোম্পানীর জোনাল অরগানাইজার হয়ে। এখানে পোষ্টেড হবার পর বিমলকে সে খুঁজে বের করেছে, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হয়েছে।

ষ্টীমার পার্টির প্ল্যানটা তারই মাথা থেকে আসে প্রথমে। বিমলের স্ত্রী বনানী লুফে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। ফলে বিমলই হয়ে ওঠে এক নম্বর উদ্যোগী। যাবতীয় ব্যয় প্রধানত তারই, লঞ্চটাও তার নিজের, নানা অকেশনে ভাড়া খাটে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন দুপুরে লঞ্চ রওনা হয়। বন্ধু ও বন্ধুপত্নীদের নিয়ে জনা দশেকের একটি দল, সঙ্গে

দুটি শিশুও আছে। তুমুল হৈ হল্লার মধ্যে যাত্রা শুরু হয়েছিল কিন্তু সন্ধ্যের দিকে বিমল সামান্য অসুস্থ বোধ করে। মাথা ধরার সঙ্গে সামান্য গা গুলোনো ভাব। হতেই পারে, কদিন খুব খাটাখাটনি গেছে। তার ওপর বাজী ধরে খগেনের সঙ্গে এই ভাদুরে রোদ্দুরে অনেকক্ষণ ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো, প্যাঁচ খেলা হয়েছে সকাল বেলায়। শুধু বিমল কেন সকলেই এই সামান্য অসুস্থতাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। অ্যানাসিন বড়ি খেয়ে আলো নিবিয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিল বিমল। পরদিন সকালে উঠে স্নান করে একদম ফ্রেশ মনে হয়েছিল। কিন্তু ওই সকালটাই, দুপুর থেকে হাওয়া ঘুরে গেল। জ্বর, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা, আর পিঠে খুব ব্যথা। মনে হল অমন জায়গায় সকালে স্নান করতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগেছে। খগেনেরও তাই মত। বুকে সর্দি বসাও বিচিত্র নয়। তার হেফাজতে বড়ি ফড়ি যা ছিল, ভিটামিন সি, সেই সঙ্গে পিঠ ম্যাসাজ করা হল। কিছু হল না বরং সন্ধ্যে নাগাদ যন্ত্রণা এত বাড়ল যে সবাই ভয় পেয়ে গেল। বিকেল থেকে অসম্ভব পিপাসা কিন্তু জলটুকু গিলতে কষ্ট হচ্ছিল। এই সঙ্গে ঘাড় আর মুখে বাঁক ধরল। আতঙ্কিত খগেন বলল, তাড়াতাড়ি লঞ্চ ঘোরাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে কোন হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, আমার টিটেনাস বলে সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু ফেরো বললেই তো আর তাড়াতাড়ি ফেরা যায় না, লঞ্চ তখন সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকে গেছে। সাড়ে আটটা নাগাদ কোন রকমে হেল্‌থ সেণ্টারে আনা হল। ডাক্তার দেখে বললেন—করেছেন কি, এরকম সিরিয়াস টাইপের ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে আমাকে প্রায় শুধু হাতেই লড়তে হবে। হেল্‌থ সেণ্টারগুলোর অবস্থা তো দিনকে দিন কি হচ্ছে জানেনই। ধরে নিন লস্ট কেস। তাই হল। সাড়ে এগারটায় সব শেষ।

ব্রজসুন্দরবাবু কিন্তু এই রোগের মধ্যে অন্য আর এক রোগের জার্ম দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর সিকসথ সেন্স সে রকমই সন্দেহ করেছিল। বনানী আর খগেনকে দেখে সেই রকমই সন্দেহ উঁকি মেরেছিল কেন জানি। ডাক্তার খুব পাজলড। রোগীর দেহে কোন

ক্ষত নেই, রোগীর জবানবন্দীর মধ্যে কোন ক্লু নেই। গত কয়েকদিনের মধ্যে কখনো কোথাও চোট খেয়েছে এমন নয়। তাহলে? কি করে তাহলে সে টিটেনাস জার্মের কনটাক্টে এল। শেষে হঠাৎ নজরে পড়ল রোগীর ঘাড়ের কাছে চুলের মধ্যে একটা রক্তাভ আঁচড় পেকে উঠেছে। খুবই নগণ্য, রোগী নিজেও অগ্রাহ্যই করে ছিল। কিন্তু ডাক্তার বুঝলেন এইটাই কনটাক্ট পয়েন্ট। জানা গেল ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে অসাবধান মুহূর্তে খগেনের লাটাইয়ের সুতো ঘষে গিয়েছিল ওর ঘাড়ে পিঠে। সরু নিবের আঁচড়ের মত সামান্য রক্ত বেরিয়েছিল হয় তো, কিন্তু ঘুড়িতে তখন প্যাঁচ লেগে গেছে, উত্তেজনার ঘোরতর মুহূর্তে কে আর সেদিকে মনযোগ দেয়।

মৃত্যুর পর অটাপ্সি রিপোর্টে জানা গেল হাইলি কনসেনট্রেটেড টিটেনাস ব্যাসিলি ওই খানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ব্রজবাবু বসে থাকলেন না। সব সময়েই তিনি অ্যাডভান্স পার্টি, এক কদম এগিয়ে চলাই তাঁর ফাস্ট নেচার। ডিপার্টমেণ্টে সবাই ঠাট্টা করে বলতো বি. এস. সি হচ্ছে ফাস্ট প্লেয়ার। সে বলেরও আগে গিয়ে পৌঁছায়। ব্রজবাবু তদন্ত সূত্রে ঘুড়ি লাটাইয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছালেন। এমনিতে শোনা যায় ঘোড়ার বিষ্ঠাতেই টিটেনাসের চারণভূমি। কিন্তু এক্ষেত্রে সুতো, অর্থাৎ মাঞ্জা। লাটাইয়ের সুতো পরীক্ষা করিয়ে প্রথমে কিছুই পাওয়া গেল না। বিমূঢ় ব্রজবাবু রাত ভোর লাটাইটা সামনে নিয়ে ক্রুডার মুরগীর মত বসে থাকলেন। সকাল বেলায় হঠাৎ তাঁর একটা আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়ল। সেই সৌখীন বোমা লাটাইটা ভর্তি গোলাপী মাঞ্জা দেওয়া সুতো। কিন্তু এক পরত নিচে কিছুটা সবুজ রঙের সুতোও দেখা যাচ্ছে। সুতো খুলতে থাকলেন। দশ বারো গজ গোলাপী সুতো খুলে ফেলার পর সবুজ রঙটা শুরু হয়েছে দেখতে পেলেন। একই রীলের সুতো, গিট নেই, ফুট পনের কুড়ি পরে, ফের গোলাপী। বাকি সবটাই গোলাপী।

ব্রজবাবু চমকে উঠলেন। এই সবুজের মানেটা কি? এটাই কি গ্রীন সিগন্যাল তাহলে? সবুজ সুতোটুকু সাবধানে পরীক্ষা

করতে পাঠালেন। সূতোয় ব্যাসিলি পাওয়া গেল ঘন মাত্রায়। খগেনকে ইন্টারোগেট করে শুধু একটাই খবর পাওয়া গেল। দোকান থেকে লাটাই-সূতো-ঘুড়ি সবই তার কিনে আনা এর বেশী সে জানে না। দোকানের মালিক ঘুড়ি-লাটাই-সূতো সায় তার ক্রেতাকে সনাক্ত করল। কিন্তু মাঝখানের সবুজ সূতোর হেঁয়ালি সে বুঝতে পারল না। বলল, মশাই তা কখনো হতে পারে? আমি কি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ বানাতে বসেছি না সূতো মাঞ্জা দিচ্ছি, বলুন? না মশাই, এরকম ব্যাপার আমার বাপের জন্মে ঘটেনি। ঘটতে পারে না।

ব্রজবাবুর মাথায় পোকা উসকে উঠল। উন্মাদের মত ছুটে গেলেন পাটনায় ভাগলপুরে এবং অন্যত্র। খড়ের গাদা হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলেন ছুঁচ। পাস্ট রেকর্ড-এ কোন খুঁত নেই, খগেনের প্রফেশন বারে বারে বদলেছে যদিও। শুধু অতীত ইতিহাসের একটা ধরতাই পাওয়া যাচ্ছে, পাটনায় বেশ কিছুদিন এক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর অধীনে ল্যাবরেটরী অ্যাসিট্যাণ্ট হিসেবে কাজ করেছিল সে। টিটেনাস ব্যাসিলি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন ডাক্তার সাহেব। খগেন তাঁকে হাতে কলমে সাহায্য করছিল।

মোটিভ রয়েছে, ব্যাসিলি কালচার সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে, তারই লাটাইয়ের সূতোয় বিমল বসুর ঘাড় ছড়ে গেছে, ইনফেকশন পিক করেছে। ওই সূতো থেকেই একটি নির্দিষ্ট রঙের সামান্য মাপের সূতোটুকুর মধ্যেই রোগের জীবাণু পাওয়া গেছে। এতগুলি যোগসূত্র সাজিয়েও খগেনকে ছিপে গাঁথা গেল না। মামলা চুকে গেল, কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা গেল অভিযুক্ত খগেন বোসবাড়িতে আবার নতুন করে যাতায়াত শুরু করেছে। এ সময়ে পরিচিত সমাজে কিছু আলোড়ন কানাঘুষোও হয়েছিল কিন্তু তখন ব্রজবাবুর আর কিছুই করার ছিল না।

ডি. সি. ডি. ডি. অনুকূল শর্মা আজ আর ব্রজবাবুকে দেখে প্রথম

দিনের মত হাল্কা তামাশায় উচ্ছল হয়ে উঠলেন না কিন্তু সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

'আসুন দাদা, বসুন।'

মুখচোখ দেখেই ব্রজবাবু আন্দাজ করেছিলেন খবর আছে। অনুকূল বছর কয়েকের ছোট হলেও এক সময় কোলিগ এবং বন্ধু ছিলেন। সৎ এবং কাজের মানুষ। তাঁরও রিটায়ারমেণ্টের সময় হয়ে এসেছে। ইন্সপেকটার তপেশ বসেছিল টেবিলের একপাশে। ছোকরা কিছুকাল আগে সাহসিকতার জন্যে পদক পেয়েছে, কাগজে দেখেছিলেন। চাকরি জীবনে একে বলতে গেলে তিনি জন্মাতে দেখেছেন। তাঁর নিজের হাতে গড়া একটি খাঁটি ইস্পাত। মুখে সব সময় হাসি আর রসিকতা লেগেই থাকে। ব্রজবাবুকে শুধু বড়দা বলেই ডাকে না মনেপ্রাণে শ্রদ্ধাও করে।

বলল, 'হ্যা বড়দা বসুন, ঘড়ি আর ক্যালেণ্ডারটা এই সুযোগে মিলিয়ে নিই।'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে অনুকূল তাঁর শুঁয়োপোকা ভুরু জোড়া তুলে তপেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উঁহু ঘড়ি না, ক্যালেণ্ডারটাই মেলাও। ঘড়িটাকে অনর্থক কেন পনের মিনিট ফাস্ট করবে?'

ব্রজবাবু লজ্জিত হয়ে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঠিক। আজ একটার সময় তাঁর আসার কথা ছিল, এখন বাজে পৌনে একটা।

রসিকতার মধ্যে না গিয়ে তিনি অনুকূল শর্মাকে শুধালেন, 'পাওয়া গেল?'

খবরের কাগজের পুরনো ফাইলের আইন আদালত ঘেঁটে খগেনের আসল নামটি উদ্ধার করার পর সিগারকেস সহ সেটি জমা দিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম দিন এসেই। বলেছিলেন, 'ভাই, এতে দুটি মানুষের হাতের ছাপ আছে। আমার যতদূর বিশ্বাস—একটি আমার, অন্যটি শঙ্কর রায়চৌধুরী অথবা পাঠকের। সঠিক জানি না। এই লোকটি

নম্বরী তাস কিনা পুরনো রেকর্ড খুঁজে দেখতে হবে। খুব কষ্ট হবে, অনেক সময় নষ্ট করতে হবে জানি।

অনুকূল হাত তুলে বললেন, 'দাদা ব্যাস। অলমিতি। আপনি চেয়েছেন, হবে। কিন্তু এই বয়েসে আর বুনো হাঁসের পিছনে কেন? পার্সোনাল কিছু ঘটেছে নাকি?'

ব্রজবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'না। জাস্ট কৌতূহল। অভ্যেস যায় না মলে জানোই তো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনুকূলবাবু আজ বললেন, 'পেয়েছি। একজন পুরনো পাপী। দাগী, তা দাগীও বলা যায়।

'কি নাম?'

'ব এস সি—ব্রজসুন্দর চন্দ্র।'

কপট দীর্ঘশ্বাসটা এইবার ধরে ফেললেন ব্রজবাবু। বললেন, 'হুঁ চিনি। অন্যজন?'

'অন্যজনের নাম শঙ্কর রায়চৌধুরী। একুশ বছর আগে, একটা ফিকটিশাস মার্ডার চার্জ উঠেছিল ভদ্রলোকের নামে। তবে ধোপে টেকেনি। অথচ দুঃখের বিষয় এই, ওই ঘটনার বছর পাঁচেক পরেই ভদ্রলোক ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে মারা যান। সুতরাং এই ছাপ আপনি কোথায় পেলেন, কি করে পেলেন, আমার মাথায় ঢুকছে না।'

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ব্রজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'শঙ্কর রায়চৌধুরী মারা গিয়েছিল, আর ইউ শিওর?'

'ডেড শিওর। ওর স্ত্রী নিজে সনাক্ত করেছিলেন। ভদ্রমহিলা ইজ ষ্টিল লিভিং। শী ইজ ফেমাস ওম্যান। অ্যাণ্ড মানিড ওম্যান নাও।'

দুহাত মুঠো করে কপালটা ধরে ব্রজবাবু চোখ বুজে আধ মিনিট বসে থাকলেন।

কী দাদা, 'লস্ট কেস নাকি?' জানতে চাইল তপেশ।

ব্রজবাবু কোন জবাব না দিয়ে দাঁড়ালেন। অনুকূলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মার্ডারের চার্জ আর তুলছি না, ওটা সাসপেন্সেই

থাক। কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিংয়ের ট্র্যাক বোধ হয় এখনো গরম আছে, যদি অভিরুচি হয় ফলো আপ করতে পারো। যদি করো, আমার সঙ্গে তোমার একটা সিটিং দরকার হবে। ফোন নাম্বার রেখে যাচ্ছি।'

ব্রজবাবু হঠাৎ এমন করে চলে যাবেন কেউই ভাবেনি। অনুকূল বাবু একটু পরেই লাফিয়ে উঠে করিডোরের দিকে ছুটলেন।

হয়তো এখনো দাদাকে ফেরানো যায়।

---